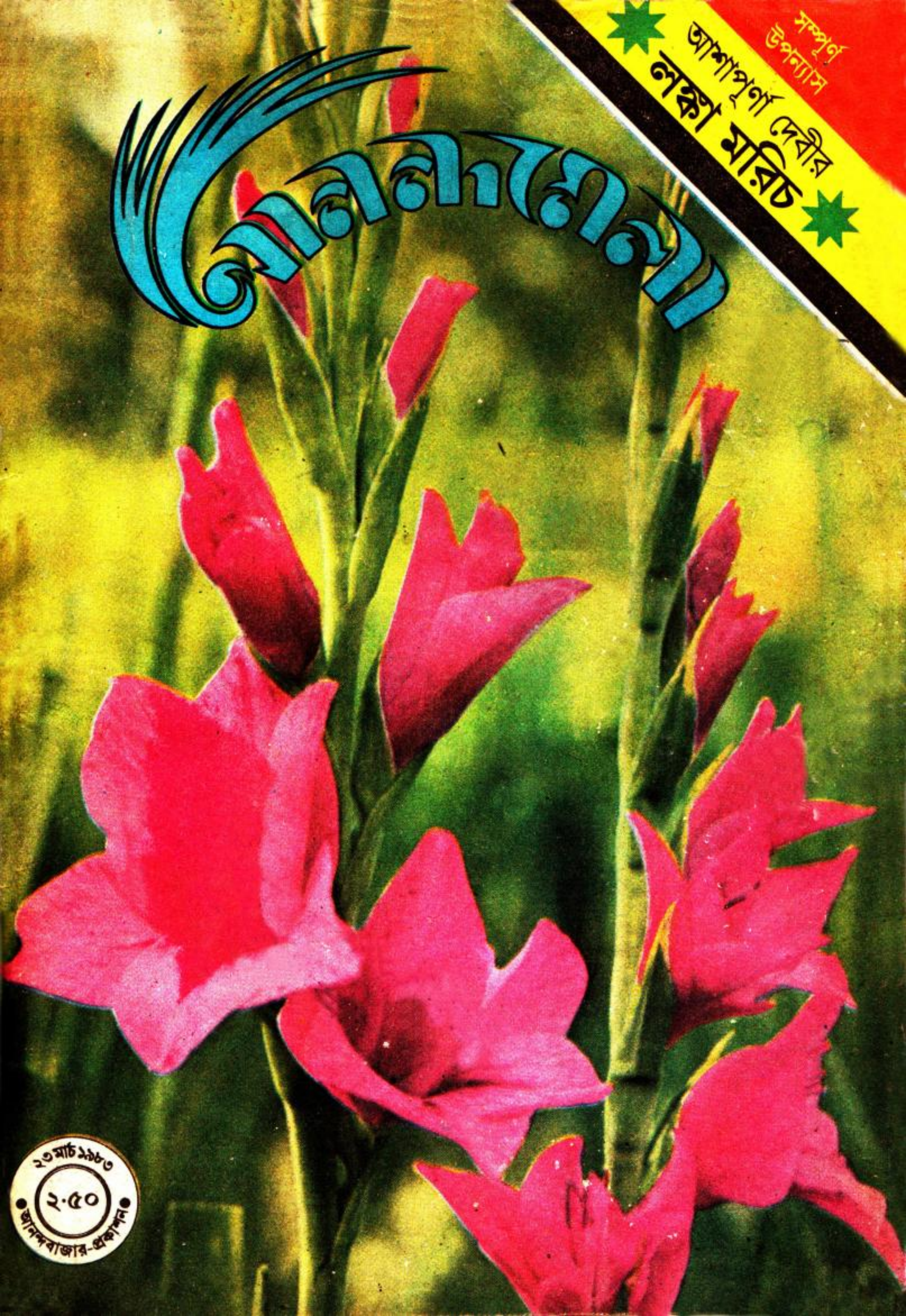
আনন্দমেলা
সম্পূর্ণ উপন্যাস
আশাপূর্ণা দেবীর
লঙ্কা মরিচ
২৩ মার্চ ১৯৮৩
২·৫০
আনন্দবাজার-প্রকাশন

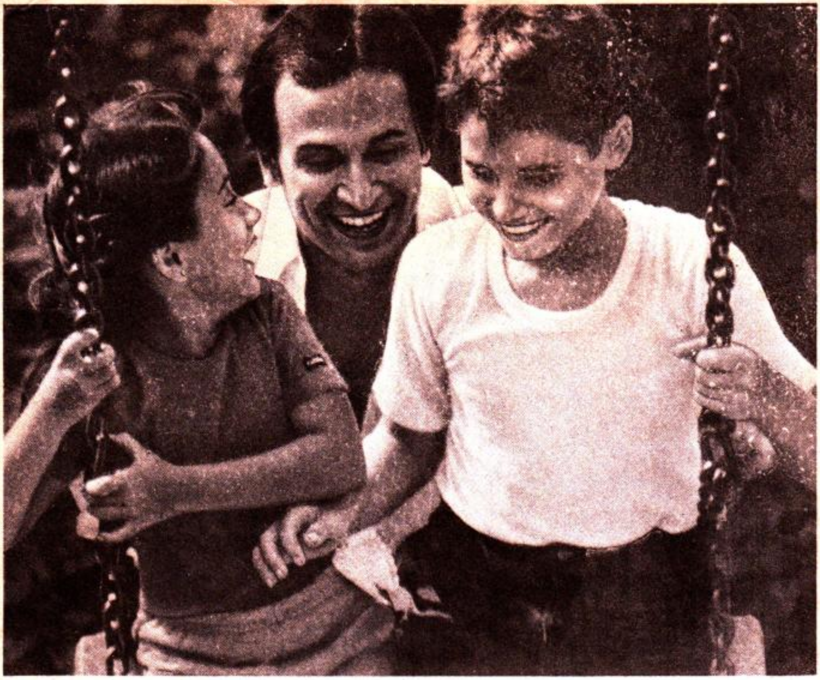

স্বাস্থ্য ঝলমল, প্রাণে খুশী উচ্ছল!
বোর্নভিটা খান।

আপনার পরিবারকে দিন
ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা যার স্বাদ
তাদের খুব পছন্দ। স্বাদেভরা
বোর্নভিটা, কোকো, মল্ট, দুধ, আর
চিনির গুণে ভরপুর। বোর্নভিটা,
আপনার পরিবারের সবাইকে
প্রতিদিন দিন—দিনে দুবার ক'রে।

OBM/8844 BEN.

ক্যাডবেরিস

বোর্নভিটা

এর গুণ বলে, তুমি বেড়ে চলো!

ফাল্গুন গেল, বসন্তকাল
অর্ধেক তবু বাকি,
দুই হাতে নিয়ে আবির-গুলাল
তাই সকলকে ডাকি ।
আকাশ-বাতাস কুমকুমে-ফাগে
মেতেছে রঙের খেলায়,
সামনেই দোল, তারই ছোঁয়া লাগে
এই আনন্দমেলায় ।

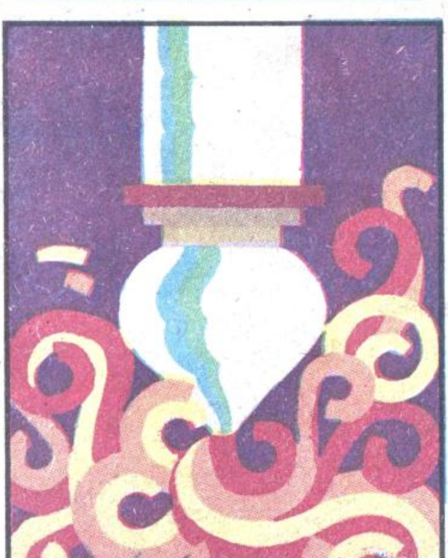

সম্পাদক : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের পক্ষে বাদ্মাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড পি ২৪৮ সি আই টি রোড, কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত । দাম দু'টাকা পঞ্চাশ পয়সা বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১০ পয়সা, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যে ১৫ পয়সা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য পত্রিকা

৮ চৈত্র ১৩৮৯ ● ২৩ মার্চ ১৯৮৩
৮ বর্ষ ● ২৫ সংখ্যা

সম্পূর্ণ উপন্যাস

লঙ্কা মরিচ । আশাপূর্ণা দেবী ৫০

ছড়া ও কবিতা

নইলে আড়ি । সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৫
কাল যদি ছুটি হয় । রত্নেশ্বর হাজরা ১১
সমাস সমস্যা । সাধনা মুখোপাধ্যায় ৪৯

ভ্রমণকাহিনী

স্বপ্নশহর হাইডেলবার্গ । অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ৭

গল্প

তৈমুরের ছোরা । সন্তোষ চট্টোপাধ্যায় ১৪
ভোম্বলমামার শব্দভেদী । চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯
আশ্চর্য চুরি । নিরঞ্জন সিংহ ৩৮

ধারাবাহিক উপন্যাস

জঙ্গলগড়ের চাবি । সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ২৫
রুআহা । বুদ্ধদেব গুহ ৪৫

স্মৃতিকথা

বসু-বাড়ি । শিশিরকুমার বসু ৩১

খেলাধুলো, কমিক্স, লেখাপড়া
তোমাদের পাতা, ধাঁধা, শব্দসন্ধান ও
অন্যান্য আকর্ষণ

প্রচ্ছদ : বিপুল গুহ

আগামী সংখ্যায়

রঞ্জিত চট্টোপাধ্যায়ের
সম্পূর্ণ রহস্যোপন্যাস
গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনা

প্রকৃতির মৃদু সমীরণ আমাদের নিপুণতায়
আপনি পাবেন সর্বক্ষণ।
প্রকৃতিই আমাদের প্রেরণা—
প্রকৃতির অনুপম নির্মল বাতাস
আপনার ঘরের মাঝে বয়ে আনবে
পোলার। ছিমছাম আকর্ষণীয়
পোলার আপনার ঘরে এনে দেবে
তরতাজা মনমাতানো দক্ষিণা
বাতাস।
পোলারের কারিগরী
কর্মকুশলতা—
এর প্রতিটি যন্ত্রাংশ সযত্নে নির্মিত
এবং আলাদাভাবে পরীক্ষিত হয়
বারবার। আর সতর্কভাবে প্রতিটি
তাইতো আপনার জীবনসাথী
হবার দাবীদার পোলার।
পোলারে আছে শক্তিশালী মোটরের
সাথে দু-দুটো বল-বিয়ারিং, ক্ষয়
রোধক অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড এবং
সেরা রেগুলেটর—যা আপনাকে
আজীবন চিন্তাহীন সেবা
দেবে।
বিক্রয়োত্তর সেবার ক্ষেত্রে পোলারের
তৎপরতার কথা সর্বজনস্বীকৃত।
পোলার

নইলে আড়ি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রামসাগর বিষ্ণুপুর পিয়ারডোবা
ভিড়ের বাসে আর আমি যাই ? তোবা তোবা !

ওন্দাগ্রাম বাঁকুড়া ভেদুয়াশোল
ফাইনালে দেখবি কে দেয় গোল।

ঝাঁটিপাহাড়ি ছাতনা
টানব, ডুবুক ফাতনা।

ইন্দ্রবিল আদ্রা শিরজাম
বাড়ল আবার ঘি-র দাম

সান্তালদি সাক্‌না রুক্‌নি
বলুন বাংলায়, ছাড়ুন বুক্‌নি।

ভোজুডি সুদামডি শিউবাবুডি
সেজেছ যে একদম ফুলবাবুটি।

খড়খড়ি গোমো রঘুনাথবাড়ি
আমাকে আচার দে, নইলে আড়ি ॥

ছবি : দেবাশিস দেব

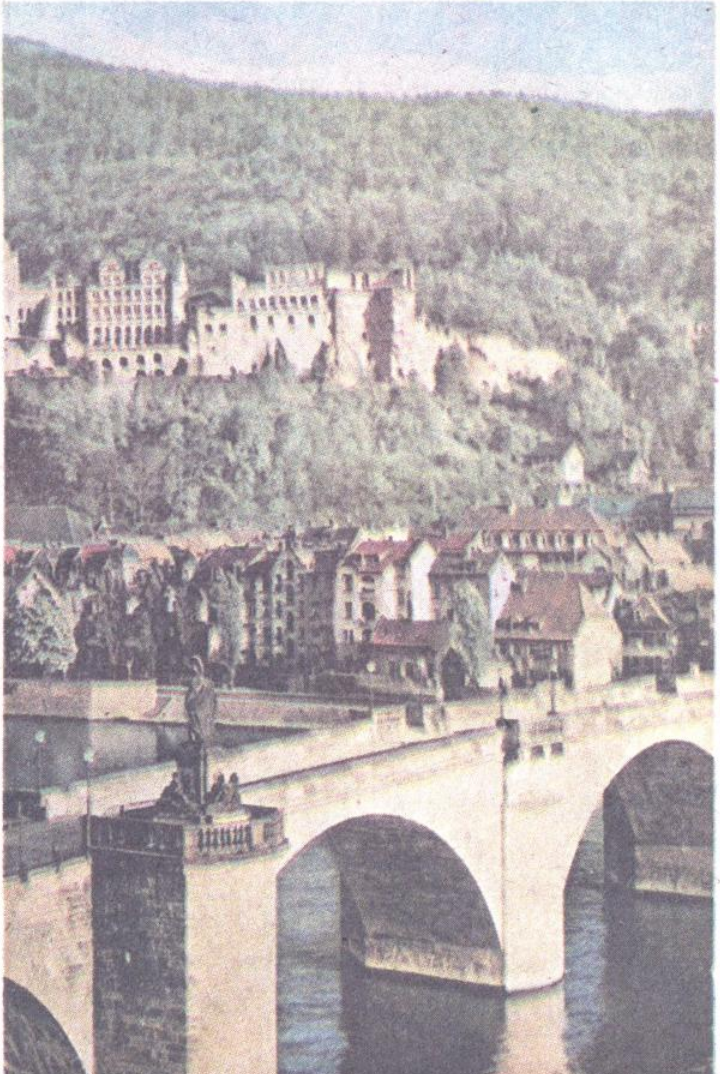

পুরনো সেতু। নীচে নদী, সামনে বাড়িঘর, তার পিছনে অরণ্য

স্বপ্নশহর হাইডেলবার্গ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

বিদূষকের আলেখ্য

সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে গিয়ে জার্মানির মহাকবি গ্যোয়েটের হঠাৎ হাইডেলবার্গের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। দিনপঞ্জির এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন : নির্মেঘ এক সকালে এই শহরের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় ঘটেছিল। ঠাণ্ডা অথচ সতেজ বাতাসের স্ফূর্তি লেগেছিল সেদিনের পরিবেশে। হুবহু যেন আদর্শের আর্শিনগর। ল্যাণ্ডস্কেপ বা প্রকৃতির চিত্রকলার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত তাঁদের পক্ষেই বুঝি এই শহরের সৌন্দর্য ধরতে

হাইডেলবার্গ শহরে যখন তুষার ঝরে, দৃশ্যপট তখন পালটে যায়

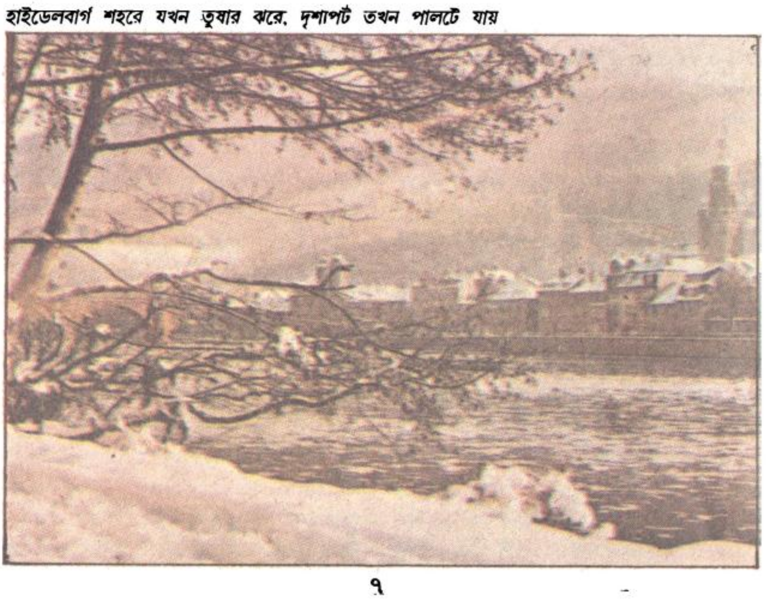

পারা সম্ভব। ভাবুক শিল্পীরা প্রকৃতি থেকে যতটা নেন ততটাই তাকে ফিরিয়ে দেন। এই কথাটা মনে রাখলেই আমরা হাইডেলবার্গের রূপ আর স্বরূপ ঠাহর করতে পারব।

এই বর্ণনা পড়ে ১৮০৭-এ জার্মানির আরেক কবি য়োসেফ ফন আইশেনডর্ফ সদলবলে হাইডেলবার্গের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন। ভোর চারটের সময় শহরের বিজয়তোরণ অতিক্রম করে তাঁর মনে হয়েছিল : জায়গাটা আমাদের সমস্ত প্রত্যাশা ছাপিয়ে যায়। শীর্ণ উপত্যাকাগুলি নেকার নদীর দুই দিকে মঞ্জরিত হয়ে আছে। নদীর বাঁ-দিকে মস্ত সুন্দর শহর হাইডেলবার্গ। একটাই প্রধান সড়ক, থেকে-থেকেই তোরণ আর বাজার। বাঁ-দিকে পাহাড়ের কিনারে উন্মুখ দুর্গ। প্রাচীন সময়ের কিছু অপরূপ ধ্বংসাবশেষও চোখে পড়ল। মানুষজন সবাই ঘুমিয়ে ছিল। শুধু ছাত্রেরাই পাইপ মুখে রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

শুধু জার্মান কবিরাই নন, নানা দেশের দিগ্বিজয়ী লিখিয়েরা নানা সময়ে এই শহরের গুণবন্দনা করে গিয়েছেন। মার্ক টোয়েন বলেছেন, হাইডেলবার্গ যেন স্বর্গ থেকে ঝরে-পড়া ছায়াপথের মতোই সুন্দর। আর ভিকতর য়ুগো জানিয়েছিলেন, ভাবনা-চিন্তা করতে ভালবাসেন এমন মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকার উপযোগী এই শহর।

ছোটবেলাতেই বইপত্তরে হাইডেলবার্গের কথা জানবার সুযোগ হয়েছিল। ইতিহাসের ক্লাসে আমাদের মাস্টারমশাই প্রাক্-ইতিহাসের সমাচার শুনিয়েছিলেন : যিশুর জন্মেরও ৫৫০০০০ বছর আগে চিবুকহীন চোয়ালসংবলিত সেই মানুষ (**Homo heidelbergenis**) যার অস্ত্রশস্ত্র ছিল হাড় দিয়ে তৈরি আর যে আগুন পোয়াতে ভালবাসত। এই অঞ্চলেই

দুর্গের ভিতরে যমজ দেবদূত

আবিষ্কৃত হয়েছিল তার দেহাস্থি। আরো শুনেছিলাম ১৩৮৬তে প্রতিষ্ঠিত এখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তান্ত। চেকোশ্লোভাকিয়ার রাজধানী প্রাগ শহরের পরেই হাইডেলবার্গের এই শিক্ষায়তনকেই ইয়োরোপের অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় বলে ধরতে হবে।

একদিন এই ইউনিভার্সিটিতেই পড়াবার ডাক পড়ল আমার। প্রথম দিনে ক্লাস নেওয়ার পালা বিকেল চারটে নাগাদ শেষ হয়ে যাবার পর আমার ছাত্র হান্‌স্‌কে বললাম, "তোমার শহর আমাকে দেখাতে নিয়ে চলো।"

হান্‌সের একটা পুরনো গাড়ি ছিল। কিন্তু আমরা ঠিক করলাম পায়ে হেঁটেই ঘুরব। হান্‌স আমাকে নিয়ে গেল বিসমার্ক স্কোয়ারে মানুষের মেলায়। দেখলাম থেয়োডোর-হয়েস ব্রিজ দিয়ে দেশবিদেশের হরেকরকম মানুষের আসা-যাওয়া। হান্‌স্‌কে জিগ্‌গেস করলাম, "ওদিকটাতে কি ট্যুরিস্টদের কোনো আকর্ষণ আছে?"

হান্‌স বলল, "হ্যাঁ। এমন একটা জায়গায় আপনাকে নিয়ে যাব যেখানে দার্শনিকেরা ট্যুরিস্টদের এড়াবেন বলেই

বেড়াতে চলে যেতেন। এখন সারা দুনিয়ার পর্যটকেরা ঐ পথটাকে দেখবে বলেই ভিড় করে আসে।"

ব্রিজ পেরিয়ে ডান দিকে পাহাড়িয়া বের্গস্ট্রাসেতে মোড় ঘুরতেই দেখলাম বিখ্যাত সেই 'দার্শনিক সরণির' (Philosophenweg) শুরু। হানস্‌কে নিয়ে ঐ রাস্তায় হাঁটতে-হাঁটতে রীতিমত রোমাঞ্চ হচ্ছিল। গোটা শহরটা এখান থেকে যেন হাতের তালুতে তুলে ধরে দেখা যায়। ছোট-ছোট বুনো বাগিচা ঘেঁষে পথ আর জিরিয়ে নেবার অসংখ্য জায়গায় তাহলে এই দেশের বিরাট স্রষ্টা আর ভাবুকেরা ভর করেছিলেন : মোৎসার্ট, ব্রাম্‌স্‌, শুমান, ফয়ারবাখ, লেসিং, হার্ডার, দুই গ্রিম আর হুমবোল্ট ভ্রাতৃযুগল, হেবেল, উলাণ্ড, হাউপ্‌ট্‌মান, হেগেল, বুনসেন, হ্যেল্ডারলিন। বুঁদ হয়ে আছি এমন সময়, সূর্যাস্তের মুখে, হান্‌স এমন একটা কথা বলে বসল যেটা মোটেই দার্শনিকসুলভ নয় : "চলুন, নীচে নেমে একটু কফি-কেক খাওয়া যাক। আজ সারাদিন কিছুই খাওয়া হয়নি।"

বলা বাহুল্য, এর উপর আর আর অন্য কথা চলে না। অতএব তার দাবিতে সায় দিয়ে রাস্তার একটা রেস্তোরাঁয় কফি খেতে-খেতে তার সঙ্গে আড্ডা জমালাম।

পরের দিন ঠাসা ক্লাসের পর শরীরে আর দম ছিল না। সপ্তাহান্তে হান্‌স্‌কে নিয়ে শহরপ্রান্তের দুর্গ দেখতে চলে গেলাম। ১৩০০ খ্রিষ্টাব্দে এর নির্মিতিকাজ আরম্ভ হয় আর শেষ হতে অন্তত চারশো বছর লেগে গিয়েছিল। দূর থেকে পাথরের লাল আভা দেখে মনে হচ্ছিল মুঘল রাজ্যে এসে পড়েছি। পৃথিবীর বিভিন্ন যুগের বিচিত্র স্থাপত্যের রীতির এমন প্রদর্শনী আগে কোথাও দেখিনি। গথিক ধরন থেকে শুরু করে রেনেসাঁস যুগের গঠন প্রণালীর জীবন্ত নমুনা এখানে মেলে ধরা আছে। ঢুকতেই রাজা রূপরেশ্‌ট্‌ বিল্ডিংয়ের দুয়ারে দুই কিশোর দেবদূতের খেলাধুলোর অপূর্ব দৃশ্য। শোনা যায়, এই ভবনের ভাস্কর্যের দুটি ছেলের অকালমৃত্যুর পর তিনি একরাত্রে স্বপ্ন দেখেন তাঁর শিয়রে দুই দেবদূত। পরদিন সকালে ঘুম ভেঙে যেই দেখলেন মৃত শিশুদের সমাধিতে রাখা গোলাপ তাঁর বিছানায় রাখা আছে, তক্ষুনি সেই যন্ত্রণাকে তিনি পাথরে খুদে রাখার কথা ভাবলেন। এই 'গথিক রিলিফে' যখন দেখলাম পাঁচ গোলাপের মালা নিয়ে যমজ দেবদূত কম্পাসজোড়া ঘিরে প্রার্থনা করছে, মনে হল ওরাই যেন জগৎটাকে শান্তির পথ দেখাবে। ফ্রিডরিশ্‌ বিল্ডিংয়ে ঝেঁপে এসেছে সাত রাজ্যির মানুষ। হান্‌স আর আমি সরাসরি চলে গেলাম সূর্য-ঘড়ির নীচের একটা হলঘরে যেখানে ভেনিস থেকে আয়না এনে ভিতরটা মুড়ে দেওয়া হয়েছিল। ১৭৬৪-তে তিন দিন চার রাত জুড়ে আগুনে দুর্গের এই অংশটি এবং সংলগ্ন আরো কয়েকটি দিক পুড়ে যায়। ১৫৩৪-এর বজ্রবিদ্যুতের উপদ্রব থেকে শুরু করে তিরিশ বছরের যুদ্ধ (১৬১৮-৪৮) ও ফরাসি অবরোধ (১৬৯৩) পার হয়ে আঠারো শতক পর্যন্ত কতবার যে এই দুর্গ প্রাকৃতিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের শামিল হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ঠিক এমনি দশা হয়েছে শহরের পুরনো কার্ল থেয়োডোর ব্রিজের। সেতুর দেবতা নেপোমুকের স্নেহপাহারা সত্ত্বেও বহিঃশক্তির আক্রমণে অনেকবার এই সাঁকো ধসে গিয়েছে। এইটেই বোধহয় ইতিহাসের ধারা : ভাঙার পরে গড়ার উদ্যম। দুর্গের টেরাসে পায়চারি করতে-করতে এক সময় হান্‌স্‌কে বললাম, "দ্যাখো, ইতিহাসের জাদুঘরে বেশিক্ষণ থাকা যায় না। চলো, নীচে নামি।"

নামবার আগে তবু একটা সেলারে ঢুকে

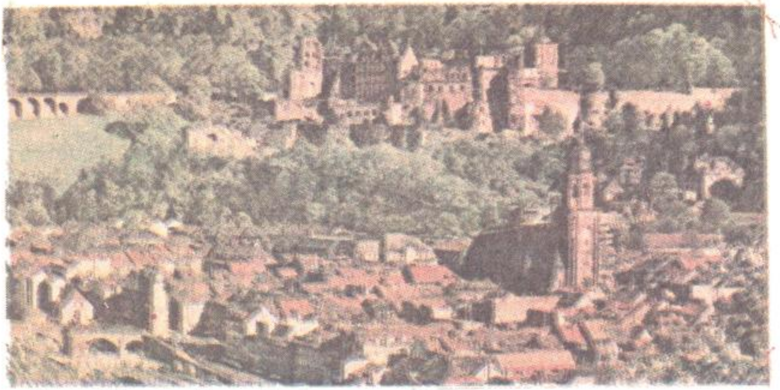

'দার্শনিক সরণি' থেকে হাইডেলবার্গ দুর্গকে যেমন দেখায়

মনে হল ইতিহাসের সঙ্গে কিংবদন্তি লতায়-পাতায় জড়ানো। ওয়াইনের একটা আধার দেখে তো আমার চক্ষুস্থির। ১৩০টা ওক গাছের গুঁড়ি দিয়ে জালাটা তৈরি (৮·৫০ উঁচু আর ৭ মিটার ব্যাসার্ধব্যাপী)। দেয়ালে কার্ল ফিলিপ আর কার্ল থেয়োডোরের রাজসভার বামন বিদূষক পের্কেও-এর আলেখ্য। বেচারা এই বিদূষক, যার অভ্যাস ছিল কিনা দিনের পর দিন ঘড়ার পর ঘড়া ওয়াইন পান, একদিন ওয়াইন না পেয়ে এক গ্লাস জল খেতে বাধ্য হয়েছিল। আর যাবে কোথায়, অমনি অক্কা পেল। বিদূষকদের বাঁচা আর মরা হয়তো বা এরকম উলটো চালেই ঘটে।

রাজারাজড়াদের শৈল প্রাসাদে মন ধরছিল না। আমরা রাস্তায় নেমে যেন বাঁচলাম। প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাড়ায়-পাড়ায় ঘুরতে-ঘুরতে আমার মনে পড়ছিল সেনেট ভাঙার আগের যুগে আমার তরুণ বয়সের তীর্থ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জমজমাট দিনগুলো আর কলেজ স্ট্রিটের প্রতিটি কোণের কথা। দিনের শেষে হান্‌সকে নিয়ে 'ছাত্রদের জেলখানায়' ঢুকে দারুণ মজা লাগল। ১৭১২ থেকে ১৯১৪ পর্যন্ত এই জেলখানা ছিল এক প্রাণবন্ত প্রতিষ্ঠান। ছাত্রেরা কর্তৃপক্ষের সঙ্গে গোলমাল বা আইন অমান্য করলে তাদের এখানে কয়েদ করে রাখা হত। সপ্তাহ দুয়েকের মেয়াদে। অপরাধ গুরুতর হলে সেই মেয়াদ মাসখানেকের মতো গড়িয়ে যেত। ছাত্রেরা প্রসন্ন মনেই এই শাস্তি গ্রহণ করত। প্রথম দুদিন স্রেফ রুটি আর জল ছিল বরাদ্দ। এর পর অবিশ্যি ক্লাসে যাওয়া বা বাইরে থেকে খাবার আনিয়ে খাওয়ার বারণ ছিল না। তবু ঐ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোনো ছাত্র ছিল না (এদের মধ্যে জগতের বরেণ্য সব পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়) যে, জোর করে কর্তাব্যক্তিদের সঙ্গে গোলমাল পাকিয়ে এখানে থাকবার জন্যে গ্রেফতার বরণ না করত। আর ভেবে দ্যাখো, যেখানে সমস্ত ছাত্র কৃত্রিম কয়েদি বনে গিয়ে স্বর্গ গুলজার করছে তাকে কী করেই বা কারাগার বলা যায়! আমি তবু হান্‌সকে বললাম, "পরশুর মধ্যে যদি টিউটোরিয়ালের জন্য তোমার লেখাটা তৈরি না করে ফেলো তবে তোমাকেও কিন্তু এখানে পুরে দেব।"

কাল যদি ছুটি হয়

রত্নেশ্বর হাজরা

সত্যি যদি কালকে ছুটি হয়েই যায়
চল্ তাহলে ঘুরেই আসি সেইখানে
দোয়েল ডেকে আজকালও যার রাত পোহায়
নাতনি দিদা ঢেঁকির ঘরে ধান ভানে।
আজকালও রোজ আল পেরিয়ে গোপাল যায়
পাশের গাঁয়ে শ্রীনাথ দাসের পাঠশালায়।

গাঙ চলেছে স্রোতের টানে উত্তুরে
বোনের বাড়ি, পুড়ছে শরীর রোদ্দুরে—
বাঁকের মুখে ঠাকুরবাড়ি—ন' মশাই
গাঁয়ের মোড়ল—গ্রাম-সুবাদে ঠাকুরভাই।
তাদের বাড়ির পরেই থাকে কামাররা
বানায় আজও কাস্তে দা।

কাটুর-কুটুর কাঠবেরালি ঘুরছে গাছ
লম্বা ঠোঁটে মাছরাঙাটা তুলছে মাছ
ঝগড়া করে বুলবুলিদের তিনটে ছা
বাউল আজও ঘুরছে গাঁ—।
বাতাস যখন শিরশিরে
শুনতে পাবি ঢাকের বাদ্যি রাত্তিরে-

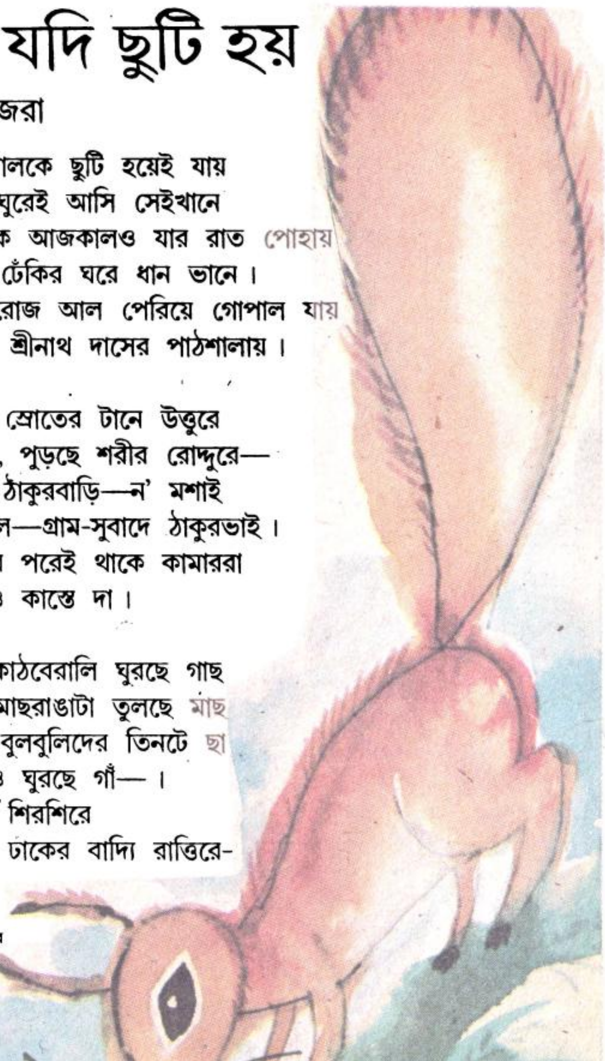

ছবি : দেবাশিস দেব

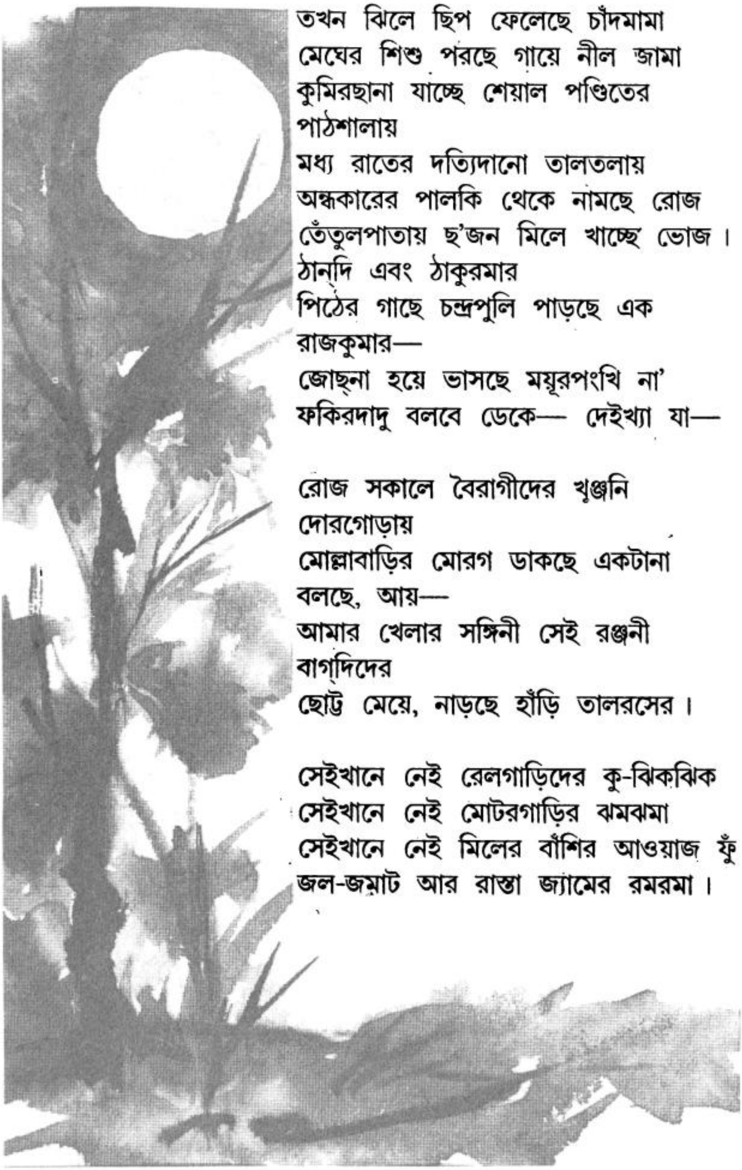

তখন ঝিলে ছিপ ফেলেছে চাঁদমামা
মেঘের শিশু পরছে গায়ে নীল জামা
কুমিরছানা যাচ্ছে শেয়াল পণ্ডিতের
পাঠশালায়
মধ্য রাতের দত্যিদানো তালতলায়
অন্ধকারের পালকি থেকে নামছে রোজ
তেঁতুলপাতায় ছ'জন মিলে খাচ্ছে ভোজ।
ঠান্‌দি এবং ঠাকুরমার
পিঠের গাছে চন্দ্রপুলি পাড়ছে এক
রাজকুমার—
জোছ্না হয়ে ভাসছে ময়ূরপংখি না'
ফকিরদাদু বলবে ডেকে— দেইখ্যা যা—

রোজ সকালে বৈরাগীদের খুঞ্জনি
দোরগোড়ায়
মোল্লাবাড়ির মোরগ ডাকছে একটানা
বলছে, আয়—
আমার খেলার সঙ্গিনী সেই রঞ্জনী
বাগ্‌দিদের
ছোট্ট মেয়ে, নাড়ছে হাঁড়ি তালরসের।

সেইখানে নেই রেলগাড়িদের কু-ঝিকঝিক
সেইখানে নেই মোটরগাড়ির ঝমঝমা
সেইখানে নেই মিলের বাঁশির আওয়াজ ফুঁ
জল-জমাট আর রাস্তা জ্যামের রমরমা।

তল্‌তা বাঁশের ঝাড় পেরিয়ে পুকুরপাড়
তারপরে সেই ছোট্ট মেঠো রাস্তাটা
ফকিরদাদুর সঙ্গে দেখা—বলবে, তুই
রতন না ?
বলব আমি, আমার নাম তো রত্নেশ্বর—।
ডান দিকে মাঠ—ঠিক যেন এক তেপান্তর-
তেমনি বিরাট চওড়া হাসির সঙ্গে তার
বলবে, ও নাম কলকাতার।
ও-নামটা তুই পোশাক দিয়া ঢাইক্যা থো
তুই আমাদের সীতানাথের ছাওয়াল তো !

সন্দেহ নেই আমিই সেই বাচ্চাটি
যার গতরে রঙ দিয়েছে ওই মাটি
ছায়ায় ঘেরা সেই জলাশয়
জলের সাথে যার কথা রোজ একলা কয়।

ভরদুপুরে চৈত্র মাসের রোদ্দুরে
ঘুরছে শিমুলতুলোর সাথে ভূতের ঝি—
যাস নে খোকা, মা ডেকে কয়, যাস্ না রে
আয় কোমরে তাগায় লোহা বাইন্ধা দি—।
সেইখানে সব বাচ্চারা পায় মার কাছে
সেই হদিস
ভূত-পেরেতের ভয়ে রামের নাম করিস।

চল্, চলে যাই সেইখানে—যার গাছতলায়
এক্কা-দোক্কা খেলছে আজও শালিক-ছা
নৌকো থেকে নামছে পাড়ে নতুন বউ
নরম মাটির মতন খালি দুইটি পা।
ফকিরদাদু ডাক দিয়ে কয়, তোর শখের
বাইল্যকালের একটা ছবি দেইখ্যা যা—

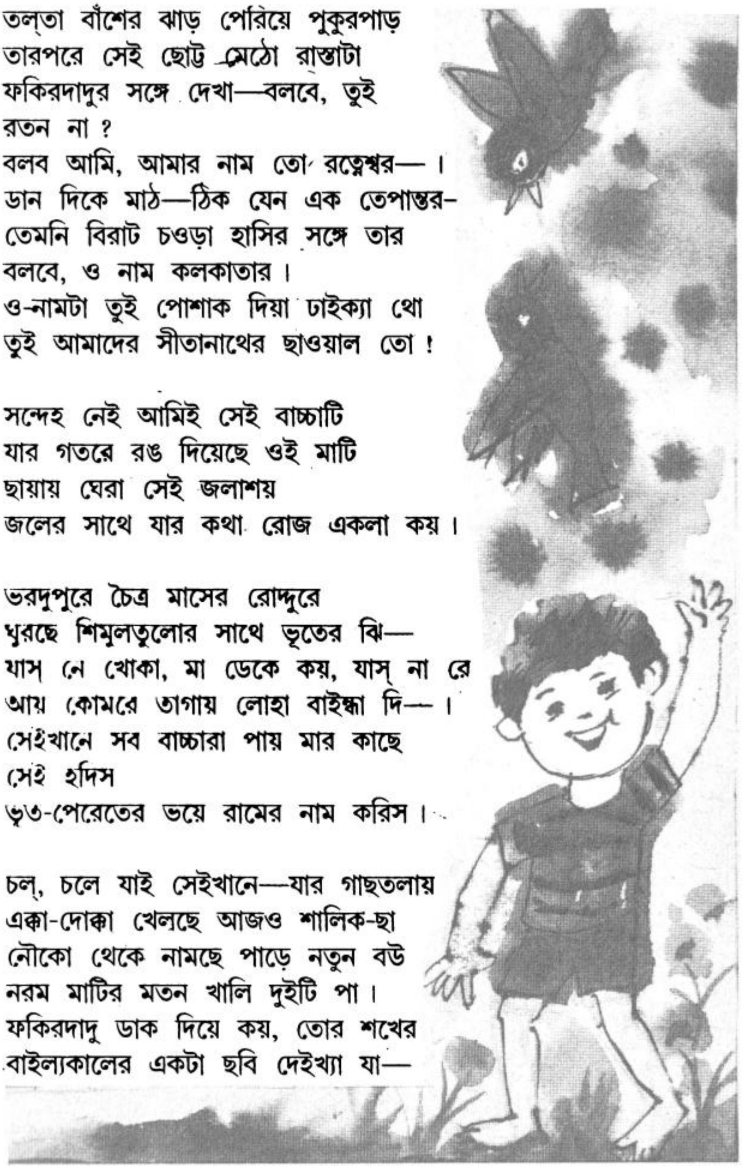

তৈমুরের ছোরা

সন্তোষ চট্টোপাধ্যায়

সুযোগ পেলেই পুরনো ঐতিহাসিক জিনিস সংগ্রহ করা আমার দারুণ শখ। তাই কোথাও গেলেই প্রথমেই খোঁজ করি এরকম জিনিসের দোকান কোথায় আছে। আমি বড়লোক নই, তবু এই বাতিকের পিছনে আমার সর্বস্ব ঢালতেও আমি তৈরি। নানা ধরনের প্রাচীন মূর্তি আর কিছু প্রত্ন-নিদর্শন ইতিমধ্যেই আমি যোগাড় করেছি। প্রাচীন মুদ্রাও আমার বেশ কিছু আছে। এ নিয়ে আমার গর্বও নেহাত কম নয়।

ক'দিন হল দিল্লি শহরে এসে পৌঁছেছি। এখানে এলে লোকে কত কীই না দেখে বেড়ায়। তাছাড়া, হালে এশিয়াড হয়ে যাওয়ায় শহরটার আদলই তো পাল্টে গেছে। কিন্তু আমি শহর দেখতে আসিনি। আমার উদ্দেশ্য পুরনো জিনিস কোথায় পাওয়া যায় তার খোঁজ নেওয়া, আর সুযোগ পেলেই তা হস্তগত করা।

লালকেল্লার কাছে যখন ঘুরতে ঘুরতে এসে পৌঁছলাম, তখন বেলা ঠিক দশটা। নেতাজি সুভাষ মার্গ বরাবর খানিকটা হেঁটে ঢুকে পড়লাম চাঁদনি চকে। একেবারে পুরনো কলকাতা। উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে দিয়ে চারদিকে তাকাতে তাকাতে হেঁটে চলতে গিয়ে আচমকাই চোখে পড়ল একটা দোকান। দাগা কিউরিও শপ। হ্যাঁ, এই রকম দোকানই তো খুঁজছিলাম।

দোকানটা খুবই ছোট। সামনেই কাউন্টার। আমি ঢুকতেই দোকানি এগিয়ে এল। মাঝবয়সী একজন শিখ।

"আসুন, বাবুজি, কী চাই বলুন?"

"পুরনো মূর্তি বা ওই রকম কিছু আছে?" বললাম।

"নিশ্চয়ই।"

লোকটা এবার নানা ধরনের কিছু প্রাচীন মূর্তি বের করল। কিন্তু আমার অভিজ্ঞ চোখে ধরা পড়ল সবই প্রায় নকল। তাই অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললাম, "ভাল কিছু থাকে তো বার করুন।" লোকটা বুঝে ফেলেছিল, আমাকে বোকা বানানো কঠিন। একটু চুপ করে ও তাই বলল, "একটা দামি জিনিস আছে, দেখাব?"

আমি সায় দিতেই লোকটা ভিতরে ঢুকে গেল, তারপর একটু বাদেই ফিরে এল ছোট্ট একটা বাক্স নিয়ে।

বাক্স খুলে ও যা বার করল তার জন্য তৈরি ছিলাম না। দশ ইঞ্চির মতো লম্বা একটা ছোরা। ছোরাটাকে সে বাক্সসমেত তুলে আমার হাতে দিতেই গা'টা কেমন শিরশির করে উঠল। ছোরার বাঁটটা ইঞ্চি চারেক হবে, ফলা ইঞ্চি ছয়ের দীর্ঘ। বাঁটে কিছু ছোট ছোট গর্ত। দেখলেই বোঝা যায়, পাথর বসানো ছিল। জিনিসটা যে খুবই পুরনো, তাতে সন্দেহ নেই।

"বাবুজি, এ হল তৈমুরলঙের ছোরা।"

"তৈমুরলঙের ছোরা?" আমি একটু অবাক হলাম। "সত্যি?"

"হ্যাঁ, বাবুজি, নিঃসন্দেহে নিতে পারেন। আমি বুঝেছি, আপনি সমঝদার আদমি। দাম বেশি নেব না, দেড় হাজার টাকা।"

তৈমুরের ছোরা কি না জানি না, কিন্তু আমার অভিজ্ঞ চোখে ছোরাটার বৈশিষ্ট্য ধরা না পড়ে পারেনি। তাই দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত এক হাজারে রফা হল। ছোরাটা কিনে ফেললাম। এ রকম জিনিস পাওয়া ভাগ্যের কথা। এর ঐতিহাসিক মূল্য অনেক।

দিল্লিতে থাকার মেয়াদ ফুরিয়ে যেতেই ট্রেনে চেপে বসলাম কলকাতায় ফিরব বলে। কিউরিও হিসেবে ছোরাটা পেয়ে মনে আমার বেশ আনন্দই হচ্ছিল। এ রকম ঐতিহাসিক জিনিস আগে একটাও যোগাড় করতে পারিনি। একটা কথা অবশ্য বলা দরকার, কেন জানি না ছোরাটা হাতে নিলেই কেমন গা-শিরশির করে। কে জানে কত নৃশংসতা এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

মাঝ-রাত্তির। ট্রেনের দোলায় বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। আচমকা একটা দারুণ চিৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। কী ব্যাপার, ঘুম-ঘুম চোখে বুঝে নিতে একটু দেরিই হল আমার। ট্রেনের কামরায় প্রচণ্ড হৈ চৈ আর কান্নাকাটিতে বুঝতে পারলাম, কামরায় ডাকাত পড়েছে।

আত্মরক্ষার কথাটা ভেবেই হয়তো ব্যাগ খুলে কখন যে তৈমুরের সেই ছোরাটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম, খেয়ালই ছিল না আমার। ছোরাটা হাতে নিতেই কী যেন একটা আমার মধ্যে ঘটে গেল জানি না, বিরাট এক হুঙ্কার ছেড়ে বাঙ্ক

থেকে লাফিয়ে পড়ে সামনে ছুটলাম।

মোট চারজন লোক ছিল। তাদের কারো হাতে ভোজালি আর কারো হাতে পিস্তল। ভোজালির ভয় দেখিয়ে তারা যাত্রীদের সর্বস্ব লুঠ করছিল।

সামনেই যে লোকটা ভোজালি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল, তারই হাতে ছোরার এক কোপ বসালাম। লোকটা আর্তনাদ করে ভোজালিটা ফেলে দিতেই তার হাত থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। বাকি তিনজন ব্যাপার দেখে আমার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার শরীরে তখন মত্ত হাতির বল। মাথাতেও খুন চেপেছে। আক্রমণকারীরা মুহূর্তে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, কেউ আর এগোতে সাহস পেল না।

নিমেষের মধ্যেই ব্যাপারগুলো ঘটে গেল। আমি কী করছি, আমার নিজেরই জানা ছিল না। ততক্ষণে কেউ শিকল টেনে ট্রেনটা থামিয়ে দিয়েছে। ছুটে এসেছে গার্ড আর কয়েকজন রক্ষী। চারজন ডাকাতই আহত অবস্থায় ধরা পড়ল।

আমার অবশ হাত থেকে তৈমুরের সেই রক্তমাখা ছোরাটা ততক্ষণে মেঝেয় পড়ে গেছে, আর আমার দুচোখে নেমে এসেছে রাজ্যের অন্ধকার।

আচ্ছন্নের মতো দেখতে পাচ্ছি, আমার চারপাশে শুধু মানুষের ভিড়। আমার কানে ভেসে আসছে নানা ভাষার টুকরো টুকরো কথা। "ওয়ান এগেনস্ট ফোর"..."অ্যায়সা কভি নেহি দেখা!"..."হি সেভড্ আওয়ার লাইভস!" ..."উনি যা করলেন তার তুলনা নেই!"

এ-সব কথা কি আমার উদ্দেশেই বলা?

ছবি : অনুপ রায়

নিজের পায়ে দাঁড়ানো

বিলেতে এখন বেকার সমস্যা প্রকট। পশ্চিম জার্মানীতেও তাই। নিউইয়র্ক শহরে অভাবের জন্য যেমন ফুটপাথে হকার বসছে, তেমনি গৃহহীনদের সমস্যাও ক্রমশঃ বাড়ছে।

আমাদের কলকাতা শহরেও এই ধরনের অনেক সমস্যা আছে। এর থেকেই বোঝা যাবে যে শহুরে সমস্যা পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই আছে এবং সমস্যা আছে বলেই সেগুলির সমাধান দরকার। আমাদের দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিটা বেশ ঘোরালো হয়ে যাচ্ছে। কাজেই এখন এই সমস্যারও মোকাবিলা করা দরকার। একদিকে যেমন কৃষিতে, শিল্পে, শক্তিতে এবং জলসেচের ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির প্রয়োজন, তেমনি অন্যদিকে অপচয় বন্ধ। নতুন শক্তি (বিদ্যুতের বদলে) ব্যবহার, পুরোন জিনিস নতুন করে ব্যবহার ইত্যাদির কথা চিন্তা করতে হবে। যেখানে আর্থিক সঙ্গতি কম, সেখানে বুদ্ধি এবং পরিশ্রম দিয়ে নিজেদের প্রয়োজন মেটানো দরকার। এর মধ্যে যেমন আছে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন, তেমনি থাকবে স্বনির্ভরতা অবলম্বন।

সবাই যদি চাকরী খোঁজে তাহলে বেকারীর জন্য অর্থনৈতিক পরিস্থিতি আরও ঘোরালো হবে। অথচ সমাজের চাহিদা অনেকরকম। তাই ভবিষ্যৎ চিন্তার সময় অথবা পড়াশুনার সময় কিভাবে স্বনির্ভর হওয়া যায় সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। এ দায়িত্ব কেবল ছাত্রদেরই নয় পিতা-মাতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিরও। ইংরেজীতে একটি কথা আছে "কেরিয়ার প্ল্যানিং"। এর মানে হল ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি রেখে এখন থেকেই বুনিয়াদ তৈরী করা ॥

জনসংযোগ বিভাগ, সি এম ডি এ ৩-এ, অকল্যাণ্ড প্লেস, কলিকাতা-৭০০০১৭ থেকে প্রচারিত)

বিজ্ঞানবিচিত্রা

রসদ বুঝে ডিম-পাড়া

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জীব হয়েও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে আমরা হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি, অথচ আরশোলার মতো নগণ্য কীটেরা এ ব্যাপারে রীতিমত পারদর্শী। যে জায়গায় যতগুলো আরশোলা পেট ভরে খেতে পাবে সে জায়গায় তার বেশি আরশোলা জন্মাবেই না। অস্ট্রেলিয়ার সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ের জীববিজ্ঞানী লীগে বেরেটন তিনটি বড় কাঁচের জারে সমান পরিমাণ ময়দা রেখে প্রথমটিতে দশটা আরশোলা দ্বিতীয়টিতে একশো আরশোলা ও তৃতীয়টিতে এক হাজার আরশোলা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনটে জারে আরশোলার ডিমগুলো গুনে দেখা গেল, প্রথম জারে ওরা যতগুলো ডিম পেড়েছে তার চেয়ে দ্বিতীয় জারে ডিম রয়েছে অনেক কম এবং তৃতীয় জারে খুবই কম। অর্থাৎ তিনটে জারেই আরশোলা ও ডিমের সংখ্যার অনুপাত হয়েছে প্রায় একই। যদি তিনটে জারে একই হারে ওরা ডিম পাড়ত তাহলে তো তৃতীয় জারের আরশোলারা এত বেড়ে যেত যে তাদের না খেয়ে মরতে হত।

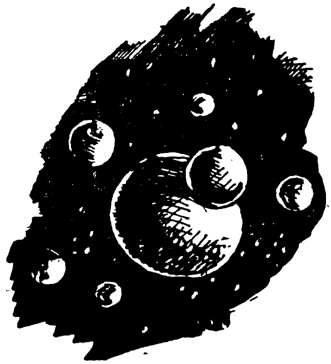

খুদে উপগ্রহ

একটি গ্রহ ক্রিকেট বলের মতো আর তার উপগ্রহটি কাঁচের গুলির মতো—যতই হাস্যকর মনে হোক, এত ছোট গ্রহ-উপগ্রহ থাকা যে সম্ভব তা অনেকদিন আগেই অঙ্ক কষে দেখিয়েছিলেন আইজাক নিউটন। কিন্তু এতদিন বাস্তবে তার দেখা মেলেনি। সম্প্রতি লাওয়েল মানমন্দিরের এডওয়ার্ড বোয়েল দূরবিনের চোখ দিয়ে একটা খুদে উপগ্রহ দেখতে পেয়েছেন। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মাঝখানে যে হাজার-হাজার খুদে গ্রহাণু সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে তাদের কয়েকটির উজ্জ্বলতা একটা নির্দিষ্ট সময় অন্তর বাড়ে কমে। বোয়েল সন্দেহ করেছেন যে, এগুলোর নিশ্চয়ই উপগ্রহ আছে। একটি উপগ্রহ যখন তার গ্রহাণুকে প্রদক্ষিণ করতে করতে পৃথিবী থেকে আড়াল করে ফেলে তখন মনে হয় যেন গ্রহাণুর উজ্জ্বলতা কমে গেল। 'পাইওনিয়ার' মহাকাশযানের দৌলতে 'মেটিস' নামক গ্রহাণুর ফোটোতে ধরা পড়েছে এমনই একটা খুদে উপগ্রহ। এর ব্যাস ৬০ কিলোমিটার এবং ১১০০ কিলোমিটার দূরে থেকে এটা মেটিসকে প্রদক্ষিণ করছে সাড়ে চার দিন অন্তর।

চঞ্চল পাল

ফ্ল্যাশ গর্ডন

এ তো ডেল নয় !
ডেল তখন পালাচ্ছে !
থামো বলছি !
তৎক্ষণাৎ ঘুরে দাঁড়াল ডেল ! হাতে আগ্নেয়াস্ত্র
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

ভোম্বলমামার শব্দভেদী

চিত্তরঞ্জন সেনগুপ্ত

ছেলেবেলায় যে পাহাড়-জঙ্গলঘেরা আধাশহরটিতে আমরা বাস করতাম তার তিন-চার মাইল পরিধির মধ্যে ছিল কয়েকটি ছোট ছোট গ্রাম। এই গ্রামগুলির সঙ্গে আমাদের একটা অদেখা পরিচয় গড়ে উঠেছিল, এজন্য যে, ওইসব গ্রাম থেকে ছেলেরা আমাদের শহরের মাইনর ইস্কুলে পড়তে আসত। গ্রামগুলির অতি নিকটেই ছিল পাহাড় অথবা জঙ্গল অথবা দুই-ই। এগুলিকে আমরা বলতাম ডিহি। এক-একটি ডিহিতে বিশ-পঁচিশটি চাষবাসি পরিবারের বাস।

যুদ্ধের সময় কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমাদের এই ছোট্ট শহরে মেজদা আর ওদের পরিবারের অন্যান্য সবাই কিছুকালের জন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন। তখনকার কথাই বলছি। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা দরকার যে, বাঘ ভাল্লুক এবং হাতি এই তিনটি বিশালকায় ও বিপজ্জনক জন্তুর নামের সঙ্গে আমাদের

বিশেষ পরিচয় ছিল, যদিও তখনও সার্কাস ছাড়া অন্যত্র কোথাও এদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি।

এদের প্রধান আস্তানা ছিল টাটানগরের কাছাকাছি দলমা পাহাড় এলাকায়। কখনও কখনও হাওয়া খেতে এরা গ্রামাঞ্চলে নেমে আসত। আমাদের বাড়ির কাছাকাছি সরকারি হাসপাতালে প্রায়ই দেখতাম বাঘ কিংবা ভাল্লুকে আঁচড়ানো বা হাতির পায়ের তলায় থেঁতলানো মানুষকে চিকিৎসার জন্য ডুলিতে করে নিয়ে আসতে। ডুলি মানে কিন্তু পালকি নয়। খাটিয়ায় সঙ্গে একটা লম্বা বাঁশের খণ্ড দড়ি দিয়ে বেঁধে দুজনে মিলে বয়ে নিয়ে আসার ব্যবস্থা।.

এইসব জন্তুরা দিনের বেলায় সাধারণত কোনও উপদ্রব করত না। কিন্তু জঙ্গলের অথবা গ্রামের আনাচে-কানাচে, অর্থাৎ যেগুলো ছিল এদের বিচরণক্ষেত্র, সেখানে কোনো কারণে উত্যক্ত বোধ করলে এরা মানুষজনকে আক্রমণ করত।

পরীক্ষার পর মৌজ করে ছুটি উপভোগ করছি, হঠাৎ বিল্টু এসে খবর দিল যে, পরশুদিন নাকি দলমা পাহাড় থেকে ছিটকে আসা একটা বাঘ দিনদুপুরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে পড়েছিল, এবং ফলে গ্রামের মানুষরা সব জোর ঘাবড়ে গিয়ে জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছিল, অর্থাৎ উল্টোটা আর কী। জঙ্গলের জীব লোকালয়ে আর লোকালয়ের মানুষ জঙ্গলে। কিন্তু ওই অঞ্চলের সেরা শিকারি শেখ ইসমাইল, সব-রেজিস্ট্রি অফিসের বড়বাবু শেখ নওয়াজির ছেলে, একা বাঘটার সঙ্গে মোকাবিলা করেছে ওর গাদাবন্দুক আর একটি মাত্র গুলি নিয়ে, কারণ তখন নাকি ওর পুঁজিতে একটির বেশি গুলি ছিল না। সবাই ধন্য-ধন্য করছে, বলছে হেম্মত আছে বটে ইসমাইল শেখের। এমন-কী সেই সূত্রে শেখ নওয়াজিরও পথেঘাটে এত অজস্র সেলাম আর নমস্কার প্রাপ্তি হচ্ছিল যে, একহাতে সাইকেল সামলে অন্যহাতে জবাব দিতে গিয়ে শেষমেশ সাইকেল থেকে পড়ে হাত ভাঙল শেখসায়েবের।

সব শুনে ঠোঁট উল্টে মেজদা বলল, 'এ আর এমন কী কথা। ওর কাছে তবু একটা গুলিও তো ছিল, ভোম্বলমামা বিনা গুলি-বারুদেই একটা ভাল্লুক মেরেছিলেন। চামড়াটা মামাদের হাতিবাগানের বাড়ির দেয়ালে টাঙানো আছে।'

আমি বললাম, 'তীর-ধনুক দিয়ে বুঝি?'

মেজদা বলল, 'যাঃ, ওসব প্রাগৈতিহাসিক অস্ত্র ভোম্বলমামা ব্যবহার করেন না কোনোদিন।'

বিল্টু বলল, 'তাহলে কি টাঙি-তলোয়ার?'

মেজদার সংক্ষিপ্ত জবাব। 'না।'

আমি বললাম, 'বর্শা-বল্লম, ব্লো পাইপ?'

মেজদা বলল, 'তাও না।'

বিল্টু মরিয়া হয়ে শুধোল, 'তাহলে কি নাঙ্গা হাতে?' অর্থাৎ খালি হাতে?

মেজদা বলল, 'বলতে পারিস তাই। কিন্তু অস্ত্র একটা ছিল। পৌরাণিক এবং আধুনিকতম অস্ত্র, শব্দভেদী বাণ।'

বিল্টু চোখ বড় বড় করে বলল, 'আই বাপ, শব্দভেদী বাণ তো শুনেছি রামচন্দ্রজির কাছে ছিল।'

মেজদা ভেংচে উঠে বলল, 'কেন, যা রামচন্দ্রজির কাছে ছিল তা শ্যামচন্দরজির কাছে থাকতে নেই বুঝি? কম্বুকম্ব কোথাকার।'

বিল্টু বলল, 'সে বাত নয় মেজদা। আমার বহুত তাজ্জব লাগছে কি কল্‌যুগেও কারো কারো কাছে শব্দভেদী বাণ আছে।'

মেজদা বললে 'আর কারও কাছে আছে কিনা জানি না, তবে আমার ভোম্বলমামার কাছে আছে জেনে রাখ্।'

বিল্টু হার মেনে বলল, 'ঠিক আছে মেজদা, তুমি কহানি বলো।'

মেজদা বলল, 'কাহিনী নয়, সত্য ঘটনা, বুঝলি? আমার ভোম্বলমামাকে তো দেখিসনি, সে একটা দেখার মতন চেহারা।'

বিল্টু বলল, 'ছয় ফুটিয়া জওয়ান বুঝি? আটতালিশ ইঞ্চি ছাতি, গামা পহলমানের

মতো ?'

মেজদা নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলল, 'ঠিক তার উল্টো। ওয়েট উনচল্লিশ কেজি। হাইট চারফুট দশ ইঞ্চি, চেস্ট টোয়েন্টি সিক্স অ্যাণ্ড হাফ, এক্সপ্যাণ্ডেড—'

আমি মেজদাকে থামিয়ে বললাম, 'এক্সপ্যাণ্ডেড মেজারমেণ্ট জেনে কী লাভ মেজদা, আমরা তো দারোগার চাকরির ইণ্টারভিউ নিচ্ছি না। তুমি বলো !'

মেজদা শুরু করল, 'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, মালকোঁচা মেরে ধুতি পরেন ভোম্বলমামা, চিরস্থায়ী অম্বলের রোগী, কিন্তু কথা বলতে পারেন চমৎকার। ওঁর কথা বলার খ্যাতি শুনে কোনো এক নেটিভ স্টেটের রাজা নাকি ওঁকে কথাকোবিদ উপাধি দিয়েছিল।'

বিল্টু ওর হিন্দির মিনে-করা স্পেশাল বাংলায় বলল, 'কথা বলায় তোমারও তো জুড়ি নেই মেজদা, তুমি তাহলে মামাজির কাবিল ওয়ারিশান।'

অর্থাৎ যোগ্য উত্তরাধিকারী।

মেজদা দাঁত কড়মড়িয়ে বলল, 'আবার ফুট কাটছিস ? তোর মাথায় সুপুরি রেখে খড়ম দিয়ে পেটাব।'

ক'মাস আগে টাইফয়েডে ভুগে মাথার সব চুল উঠে গিয়েছিল বিল্টুর। ভয় পেয়ে যেন সুপুরিটা ঠেকাবার জন্যই মাথায় হাত দিয়ে সে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে মেজদা, তুমি বলো, আমি তোমার কথার বিচে আর কথা বলব না।'

আগের কথার খেই ধরে আবার শুরু করল মেজদা, 'বুকে দুর্জয় সাহস আর বাহুতে অমিত বিক্রম, এই দুই নিয়ে ভোম্বলমামা।'

আমি না পেরে বললাম,'সে কী মেজদা, উনচল্লিশ কেজির বডিতে ফিট করা যে বাহু, তাতে অমিত বিক্রম থাকে কী করে ? সাহসের সঙ্গে অবশ্য শরীরের কোনো সম্পর্ক নেই।'

মেজদা গর্জন করে উঠল, 'বুকে দুর্জয় সাহস থাকলেই বাহুতে অমিত বিক্রম থাকে। থাকতে হয়। ওটা অটোমেটিক। পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। কিন্তু কথার মাঝে এমন উটকো ব্যারিকেড সৃষ্টি করলে কি গল্প হয় ?'

আমরা ঝটিতি মেনে নিয়ে বললাম, 'ঠিক আছে মেজদা, তুমি বলো, এখন থেকে আমরা স্পিকটি নট।'

মেজদা বলল, 'ভোম্বলমামা পেশায় ছিলেন জিওলজিস্ট। নানারকম প্রসপেক্টিং-এর কাজে ভোম্বলমামাকে সারা ভারতবর্ষ চষে বেড়াতে হত। রেলে স্টিমারে উড়োজাহাজে তো বটেই, কখনও কখনও হাতি বা ঘোড়াতে সওয়ার হয়ে, আবার কখনও বা পায়ে হেঁটে। সেবার উড়িষ্যার এক গহন জঙ্গল দিয়ে হেঁটে আসছেন ভোম্বলমামা। সঙ্গে জন-কয় আদিবাসী মজুর ভোম্বলমামার কাঁধে বন্দুক, কোমরে টোটার বেল্ট। ভোম্বলমামা কিন্তু জীবনে কোনোদিন বন্দুক চালাননি, মানে চালনোর দরকার হয়নি। একবার মাত্র ট্রিগারে হাত দিয়েছিলেন। কোনো-এক পাহাড়ি রাস্তা দিয়ে একদিন নাকি হেঁটে আসতে আসতে দেখেছিলেন একটা খরগোশ কান তুলে নাচানাচি করতে করতে ভোম্বলমামার আগে আগে হেঁটে যাচ্ছে। ভোম্বলমামাকে তোয়াক্কা না করেই। মামার হল বেজায় রাগ। বন্দুকটা তাক করে যেই ট্রিগারে হাত দেবেন, অমনি খরগোশটা ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে ফিক করে হেসে ভোম্বলমামাকে রাস্তা ছেড়ে দিয়ে ঝোপের মধ্যে অদৃশ্য হল। ট্রিগারটা টেপার আর দরকার হল না। তা, সেদিনও ভোম্বলমামার কাঁধে ছিল বন্দুক। তাছাড়া মজুরগুলোর হাতে দেশীয় অস্ত্র-শস্ত্র, মানে টাঙ্গি ভাল্লা ইত্যাদি, এমন সময়ে—'

মেজদা থামল। আমাদের বুক দুরুদুরু। আসল বোমাটি এবার ফাটবে বোধ করি। মেজদা ঝটিতি 'রুট' বদল করে আলটপকা জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, অ্যালার্জি মানে কী বল্ তো ?'

বিল্টু আমতা-আমতা করে বলল,'অ্যালার্জি মানে—অ্যালার্জি মানে, হল

গিয়ে—ওই অ্যালার্জি।'

মেজদা ভেংচে উঠল, 'আহাহা, অ্যালার্জি অ্যা-লা-র্জি। বিদ্যার অর্ণব তুমি। বিদ্যার সাগরে ভাসছ। যতসব কক্ষকম্বের দল।'

আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, 'অ্যালার্জি মানে বোধহয় বিরূপ প্রতিক্রিয়া।'

মেজদা বলল, 'কতকটা তাই। আমার

মনে হয় কাতুকুতুও একপ্রকার অ্যালার্জি। কারো কারো যেমন চিংড়ি মাছে অ্যালার্জি। খেলে ছুঁলে বা দেখলে গা-ময় ফুসকুড়ি বেরোয়, তেমনি কারো কারো কাতুকুতু দেওয়ার ভঙ্গিতে হাত দেখালেই কাতুকুতু লেগে যায়। সেই অ্যালার্জিটাকেও কাজে লাগিয়েছিলেন ভোম্বলমামা।'

বিল্টু ঘাড় নেড়ে বলল, আগে বাড়ো।'

মেজদা আবার শুরু করল, 'জোছনা রাত। ঘন জঙ্গলের পথ। পাতার ফাঁকে ফাঁকে চাঁদের আলো এসে পড়েছে মাটিতে। চুঁয়ে চুঁয়ে পড়া মধুর মতো। জঙ্গলের মধ্যে বিশাল বিশাল শাল পিয়াল আর মহুয়ার গাছ। জঙ্গলটা পার হয়ে একটা আখের খেতের ধারে পৌঁছেছেন ভোম্বলমামা, ঠিক সেই সময় মজুরগুলো থমকে দাঁড়াল। একজন ফিসফিসিয়ে বলল, 'হুজুর, ভালু—'

ভোম্বলমামা তাকিয়ে দেখলেন যে, ভাল্লুকটা একটা আখের টুকরো নিয়ে আপন মনে চিবোচ্ছে। ওদের দেখে ভাল্লুকটা রাগে গরগর করতে করতে পিছনের পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। সামনের পা দুটো দিয়ে হাতের মতো আড়াআড়ি ভাবে ধরে তখনও চিবোচ্ছিল ভাল্লুকটা। ভোম্বলমামা কাঁধ থেকে বন্দুকটা নামাতে যাবেন এমন সময়—'

উত্তেজনায় বিল্টুর মুখ দিয়ে ওর অজান্তেই বেরিয়ে এল, 'আই বাপ।'

মেজদা পুরনো কথার খেই ধরল; 'এমন সময় ভোম্বলমামার নজরে পড়ল, আখের টুকরোটা দাঁতের ফাঁকে চেপে ভাল্লুকটা দু'হাত উপরে তুলে এগিয়ে আসছে। এক মুহূর্তে সব-কিছু ভুলে গেলেন ভোম্বলমামা। ওর মনে হল, একজোড়া লোমশ হাত বুঝি বা ওঁকে কাতুকুতু দিতে আসছে। অমনি শুরু হল হাসি। ভোম্বলমামা একপ্রস্থ হাসেন। হাসতে হাসতে পেট চেপে ধরে বসে পড়েন। ভাল্লুকটাও হতভম্বের মতো হাত নীচে নামায়। ভোম্বলমামা হাসি সামলে আবার বন্দুকটা তুলে তাক করতে যান। আবার ভাল্লুকটা হাত দুটো ওপরে তোলে, আবার

হাসির ডেমোনেস্ট্রেশন শুরু হয়, তখন ভাল্লুকটা হাত নামায়, আবার ভোম্বলমামা ট্রিগার টিপবার জন্য তৈরি হন, ভাল্লুকটা হাত ওপরে তোলে, এরকম চলে বেশ কয়েকবার। শেষমেশ আর হাসি সামলাতে পারেন না ভোম্বলমামা। হাসেন। শুধু হাসেন। হেসে চলেন। হা-হা হাসি, হো-হো হাসি, হি-হি হাসি, খিলখিলিয়ে হাসি, খলখলিয়ে হাসি, উচ্চহাসি, অট্টহাসি, সবরকম হাসির পালা শেষ করে অবশেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন ভোম্বলমামা। সম্ভবত ভাল্লুকটাও। বার বার হাত তুলতে আর নামাতে গিয়ে জেরবার হয়ে যায় ভাল্লুকটা। আর সে কী হাসির ঘটা। কলকাতার যাত্রার বাঘা-বাঘা অ্যাক্টররাও হার মেনে যায়। এদিকে এ-রকম অবস্থা দেখে মজুররা যে যেখানে পেরেছে, গাছের ডালে, শেয়ালের খোঁদলে, ঘন ঝোপের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে। হাসির দমকে বন্দুকটা কাঁধ থেকে খসে গড়াগড়ি যাচ্ছে। বেল্ট খুলে গিয়ে টোটাগুলো মাটিতে পড়ে ছত্রকার।

'তারপর ভোম্বলমামার আর মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল, দেখলেন, ভাল্লুকটা চোখ উল্টে মরে পড়ে রয়েছে।'

বিল্টু কয়েক মুহূর্ত ঝিম মেরে বসে থাকার পর বলল, 'বড়ি তাজ্জব কি বাত। কী করে এমন হল ?'

বিজ্ঞের মতো হেসে মেজদা বলল, 'ওইটাই তো আসল বাত। একে বলে য়্যুটিলাইজেশন অব এনার্জি।'

'নাকি অ্যালার্জি ?' বোকা-বোকা মুখ করে বিল্টু বলল।

'মানে ?' আমি বললাম।

মেজদা বলল, 'ভোম্বলমামা ওঁর হাসিটাকে এমন একটা ফ্রিকুয়েন্সিতে বেঁধে নিয়েছিলেন যে, তার ভাইব্রেশনে ভাল্লুকটার হৃৎপিণ্ডটা ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছিল।'

'কিন্তু সেই ভাইব্রেশনে মানুষের কিছু হয় না ?'

'সব ভাইব্রেশন মানুষের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। যেমন গাল্টন হুইসিল-এর সুপারসনিক ভাইব্রেশন কুকুরের কানে ঠিক পৌঁছায় কিন্তু মানুষের কানে পৌঁছায় না।'

মন থেকে ধন্দ তবুও যায় না। আমি বললাম, 'কিন্তু মেজদা, শব্দভেদী মানে তো শব্দকে বিদ্ধ করে যাহা, বহুব্রীহি সমাস।'

মেজদা চটে উঠে বলল, 'শব্দ বিদ্ধ করে যাহা, এও বহুব্রীহি।'

বুদ্ধি দিয়ে এইপ্রকার বহুব্রীহির ব্যাখ্যাকে বিদ্ধ করতে না পেরে আমি আর বিল্টু পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ছবি : দেবাশিস দেব

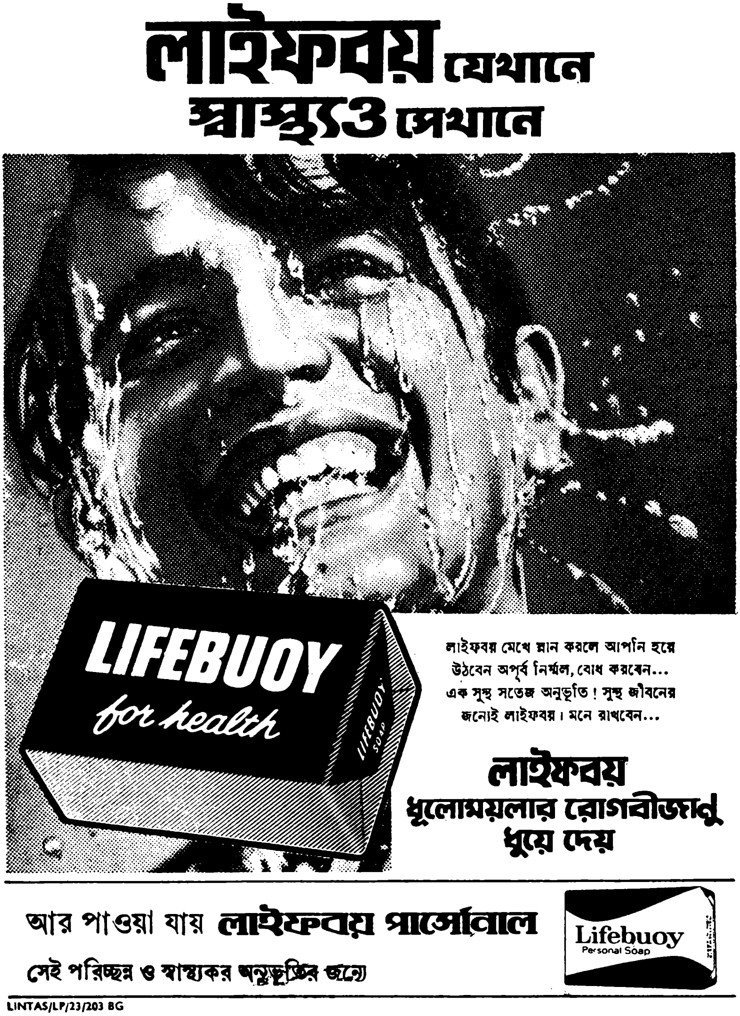
লাইফবয় যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে
LIFEBUOY
for health
LIFEBUOY SOAP
লাইফবয় মেখে স্নান করলে আপনি হয়ে উঠবেন অপূর্ব নির্ম্মল, বোধ করবেন... এক সুস্থ সতেজ অনুভূতি ! সুস্থ জীবনের জন্যেই লাইফবয়। মনে রাখবেন...
লাইফবয়
ধূলোময়লার রোগবীজানু ধুয়ে দেয়
আর পাওয়া যায় লাইফবয় পার্সোনাল
সেই পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যকর অনুভূতির জন্যে
Lifebuoy
Personal Soap
LINTAS/LP/23/203 BG

জঙ্গলগড়ের চাবি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আগে যা ঘটেছে : সকাল বেলা পার্কে কারা যেন কাকাবাবুকে গুলি করে পালিয়ে যায়। কাকাবাবু প্রাণে বেঁচে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর শরীরে পক্ষাঘাতের মতন হয়ে গেল। স্বাস্থ্য ফেরাবার জন্য তাঁকে নিয়ে আসা হল ত্রিপুরায়। সেখানে নানারকম উপদ্রব হতে লাগল। তারপর এক রাতে একদল মুখোসধারী এসে সন্তু আর কাকাবাবুকে ধরে নিয়ে গেল জোর করে। একটা নির্জন বাড়িতে ওদের বন্দী করে রাজকুমার নামে একজন লোক কাকাবাবুর ওপর নানা রকম অত্যাচার করতে লাগল, তাঁর কাছ থেকে জঙ্গলগড়ের খবর জানবার জন্য। এমন সময় কাকাবাবুর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা পুলিশ নিয়ে এসে পড়ায় পালিয়ে গেল ওরা। সঙ্গে নিয়ে গেল সন্তুকে। টিলার ওপরে একটা পাথরের বাড়িতে আটকে রাখা হল সন্তুকে। রাজকুমার সন্তুকে দিয়ে জোর করে একটা চিঠি লেখাল কাকাবাবুর কাছে। কাকাবাবু যখন সেই চিঠি পেলেন, তার আগেই সন্তু পালিয়েছে আবার। সন্তু নিজেই পৌঁছে গেল জঙ্গলগড়ে। তারপর

॥ ২৫ ॥

কাকাবাবু একা একাই দুপুরের খাওয়া শেষ করলেন। নরেন্দ্র ভার্মা কিংবা শিশির দত্তগুপ্তর দেখা নেই। ওঁরা কোনো খবরও পাঠাননি। তবে একটু আগে শিশির দত্তগুপ্তর একজন আর্দালি এসে এক জোড়া ক্রাচ দিয়ে গেছে।

খেয়ে উঠে কাকাবাবু নিজের আঁকা ম্যাপগুলো দেখলেন কিছুক্ষণ ধরে। মোট পাঁচটা ম্যাপ। তার মধ্যে চারখানা ছিঁড়ে ফেলে একখানা রাখলেন তিনি। সেটাকে আবার নতুন করে আঁকলেন। তারপর সেটাকে পকেটে ভরে রেখে তিনি ক্রাচ বগলে দিয়ে হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন জানলার কাছে। অনেকদিন বাদে তিনি নিজে নিজে হাঁটলেন, কেমন যেন নতুন নতুন লাগছে।

আকাশটা মেঘলা মেঘলা। চারদিকে কেমন যেন ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। বেশ একটা বেড়াবার মতন দিন। কাকাবাবু ভাবলেন, এখন সন্তু কোথায়? কী করছে? ছেলেটাকে ওরা ঠিক মতন খেতে টেতে দিয়েছে তো?

এবারে তিনি বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে নামতে লাগলেন সিঁড়ি দিয়ে। ক্রাচ্ নিয়ে হাঁটার অসুবিধে এই যে, খট খট শব্দ হয়। কাকাবাবুর নিজস্ব ক্রাচের তলায় রবার লাগানো আছে। কিন্তু সে দুটো তো সঙ্গে আনেননি।

নীচতলায় যে দুজন পুলিশের পাহারা দেবার কথা, তারা এখন রান্নাবান্না নিয়ে ব্যস্ত। কাকাবাবু যে বাগানের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন তা তারা লক্ষও করল না। কাকাবাবু একটু মুচকি হাসলেন।

সামনের লোহার গেটটা অবশ্য বন্ধ। তালা দেওয়া। অগত্যা কাকাবাবু নিজেই গেটের গায়ে দু বার থাবড়া মারলেন। সেই আওয়াজ শুনে একজন পুলিশ বেরিয়ে এল আর কাকাবাবুকে দেখে প্রায় ভূত দেখার মতন মুখের ভাব হয়ে গেল তার।

একটু তোতলাতে তোতলাতে সে বললে, "এ-এ-এ কী, স্যার! আ-আ-আ-প্‌নি!"

কাকাবাবু বললেন, "আমি একটু বাইরে বেড়াতে যাব, গেটটা খুলে দাও :"

পুলিশটি বলল, "আ-আ-প্‌নি বেড়াতে

যা-যা-যাবেন ? আপনার তো অসুখ ! আপনি নিজে নিজে হাঁটছেন ?”

কাকাবাবু বললেন, “অসুখ ঠিক হয়ে গেছে। খেয়ে ওঠার পর আমার একটু হাঁটাহাঁটি করা অভ্যেস।”

“তবে একটু অপেক্ষা করুন স্যার। আমরাও যাব আপনার সঙ্গে। আমরা ততক্ষণে একটু খেয়ে নিই। উনুনে তরকারি ফুটছে !”

“আমার সঙ্গে যাবার দরকার নেই। আমি এক্ষুনি ফিরে আসব ”

“না, স্যার, তা হয় না ! আমাদের বড় সাহেব বলেছেন . . . ”

“তোমাদের বড় সাহেব কি আমায় আটকে রাখতে বলেছেন ! যাও, শিগগির চাবি নিয়ে এসো !”

কাকাবাবুর ধমক খেয়ে লোকটি আর তর্ক করতে সাহস করল না। চাবি এনে গেট খুলে দিল।

কাকাবাবু বললেন, “তোমাদের সাহেব এলে বসতে বোলো। আমি ফিরে আসব। আর দিল্লি থেকে যে সাহেব এসেছিলেন, তিনি ফিরলে বোলো, আমার যেখানে যাবার কথা ছিল সেখানে গেছি।”

“কোথায় যাচ্ছেন স্যার, বলে যাবেন না ?”

“বললুম তো, একটু বেড়াতে যাচ্ছি। অনেকদিন হাঁটা হয়নি ভাল করে !”

গেট থেকে বেরিয়ে কাকাবাবু কিন্তু বেশিক্ষণ হাঁটলেন না। একটা সাইকেল রিকশা পেয়ে তাতে চেপে বসলেন।

রিকশাওয়ালা জিজ্ঞেস করল, “কোন দিকে যাব বাবু ?”

কাকাবাবু বললেন, “চলো যেদিকে খুশি ! বেশ মেঘলা মেঘলা দিন, আমায় কোনো ভাল জায়গায় একটু হাওয়া খাইয়ে নিয়ে এসো। তুমি দশটা টাকা পাবে।”

রিকশা চলতে শুরু করতেই কাকাবাবু চোখ বুজলেন, যেন তাঁর কোনো দুশ্চিন্তাই নেই। সত্যিই তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন।

দুজন সাইকেল-আরোহী একটু বাদেই কাকাবাবুর দু পাশ দিয়ে চলে গেল তাঁর দিকে ভাল করে তাকাতে তাকাতে। খানিক দূর গিয়ে লোক দুটি আবার ফিরে এল। কাকাবাবুকে আবার ভাল করে লক্ষ করে তারা চলে গেল খুব জোরে সাইকেল চালিয়ে। কাকাবাবু এসব কিছুই দেখলেন না। যেন তিনি ঘুমোচ্ছেন।

সাইকেল-রিকশাটা শহরের ভিড় ছাড়িয়ে চলে এল একটা ফাঁকা জায়গায়। সামনেই একটা ছোট পাহাড়। আকাশে মেঘ আরও গাঢ় হয়েছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

রিকশাওয়ালা থেমে গিয়ে বলল, “ও বাবু ! বৃষ্টি আসতেছে। এবার কোথায় যাবেন ?”

কাকাবাবু চোখ মেলে উঠে বসে বললেন, “এ কোথায় এসেছ ? বাঃ, বেশ জায়গাটা তো !”

রিকশাওয়ালা বলল, “এদিকটা তো বাবু কুঞ্জবন। কাছেই পুরনো রাজবাড়ি আছে।”

কাকাবাবু বললেন, “রাজবাড়ি আছে থাক, সেদিকে যাবার দরকার নেই, আরও ফাঁকার দিকে চলো।”

“জোরে বৃষ্টি এসে যাবে যে বাবু !”

“ও, বৃষ্টি আসবে বলছ ! তা হলে তো আর তোমার সাইকেল-রিকশা চলবে না !”

কাকাবাবু রিকশা থেকে নেমে চারদিকে চেয়ে দেখলেন। যেন তিনি কোনো চেনা লোককে খুঁজছেন। কিন্তু কাছাকাছি মানুষজন কেউ নেই। তবে দূর থেকে একটা মোষের গাড়ি আসতে দেখা যাচ্ছে।

রিকশা-চালককে দশ টাকার একটা নোট দিয়ে কাকাবাবু বললেন, “তুমি এবারে যেতে পারো।”

রিকশা-চালক তবু চিন্তিত ভাবে বলল,

"জোর বর্ষা আসছে, আপনি এখান থেকে ফিরবেন কী করে?"

কাকাবাবু বললেন, "সেজন্য তোমার চিন্তা নেই। আমি এখন ফিরব না।"

মোষের গাড়িটা কাছে আসতেই কাকাবাবু হাত তুলে সেটাকে থামালেন। গাড়োয়ান ছাড়া সে গাড়িতে আর কেউ নেই। মাঝখানের ছাউনিতে রয়েছে কয়েকটা বস্তা।

কাকাবাবু সেই গাড়ির গাড়োয়ানকে জিজ্ঞেস করলেন, "কোন দিকে যাচ্ছ গো কর্তা?"

গাড়োয়ান বলল, "যাচ্ছি তো বাবু, অনেক দূর। সেই কমলপুর।"

কাকাবাবু সন্তুষ্টভাবে বললেন, "বাঃ বেশ, বেশ! আমিও ঐ দিকেই যাব। আমায় নিয়ে যাবে? চিন্তা কোরো না, যা ভাড়া লাগে তা আমি দেব। তুমি গাড়িটা একটু নিচু করো, নইলে তো আমি উঠতে পারব না!"

কাকাবাবু উঠে বসার পর মোষের গাড়িটা চলতে লাগল ঢিমে তেতালায়। কাকাবাবু ছাউনির মধ্যে বসে গাড়োয়ানের সঙ্গে গল্প করতে লাগলেন। বৃষ্টি পড়তে লাগল জোরে।

সেই বৃষ্টি ভিজেই দুজন সাইকেল-আরোহী আবার আস্তে আস্তে যেতে লাগল মোষের গাড়িটার পাশে পাশে। কাকাবাবুর দিকে তারা গভীর মনোযোগের সঙ্গে তাকিয়ে রইল। কাকাবাবুর সঙ্গে একবার চোখাচোখি হতেই তারা পালিয়ে গেল শাঁ শাঁ করে।

কাকাবাবু বললেন "আরেঃ!"

লোক দুটি কিন্তু বেশি দূর গেল না। খানিকটা এগিয়েই আবার সাইকেল ঘুরিয়ে এদিকে আসতে লাগল। তারা কাছাকাছি এসে পড়তেই কাকাবাবু হাতছানি দিয়ে ডেকে বললেন "এই যে, শোনো, শোনো!"

এবার তারা উল্টোদিক থেকে আসছে বলে গাড়ির পাশে পাশে চলতে পারে না। একজন থেমে পড়ল। কাকাবাবু মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, শোনো, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে বলতে পারো?"

লোকটি যেন কিছুই জানে না এই রকম ভাবে শুকনো মুখে বলল, "রাজকুমার? কোন রাজকুমার?"

কাকাবাবু কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "আমি যে রাজকুমারের কথা জিজ্ঞেস করছি, তাকে তুমি চেনো না?"

লোকটি বলল, "কই, না তো!"

কাকাবাবু বললেন, "তবে এখানে ঘুরঘুর করছ কেন? যাও, ভাগো!"

ঠিক তক্ষুনি একটা জিপগাড়ির আওয়াজ শোনা গেল। সাইকেল-আরোহী আর কাকাবাবু দুজনেই তাকালেন সেদিকে।

জিপটিও এসে থামল মোষের গাড়ির পাশে। কালো প্যান্ট আর কালো শার্ট পরা লম্বামতন একজন লোক মুখ বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল "কী ব্যাপার!"

কাকাবাবু লোকটির আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করে জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে, তুমি জানো নাকি, রাজকুমারকে কোথায় পাওয়া যাবে?"

লোকটি বলল, "হ্যাঁ, জানি, আমি রাজকুমারের কাছেই যাচ্ছি। আপনি যাবেন আমার সঙ্গে?"

কাকাবাবু বলল, "নিশ্চয়ই! বাঃ, বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়ে গেল।"

মোষের গাড়ির গাড়োয়ানের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "ওহে, জিপগাড়ি পেলে কে আর মোষের গাড়িতে যেতে চায় বলো! তোমার গাড়িটা নিচু করো, আমি নেমে পড়ি! এই নাও তুমি দশটা টাকা নাও!"

কাকাবাবু জিপগাড়িতে বসলেন সামনের সিটে। পেছন দিকে তিনজন গুণ্ডামতন চেহারার লোক বসে আছে গম্ভীর ভাবে।

কাকাবাবু বললেন, "হুঁ, ব্যবস্থা বেশ ভালই। আমি নিজে থেকে যেতে না চাইলে তোমরা কি আমায় জোর করে নিয়ে যেতে?"

কালো শার্ট পরা লোকটি বলল, "আপনি কী করে জানলেন যে আমরা এই রাস্তায় আসব!"

কাকাবাবু আবার কাষ্ঠহাসি হেসে বললেন, "বাঘ জঙ্গলে বেরুলেই তার পেছনে ফেউ লাগে। আমি জানতুম, আমি যে দিকেই যাই না কেন, তোমরা ঠিক আমার পেছন পেছন আসবে!"

কালো শার্ট পরা লোকটাও অকারণে হেসে উঠল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "যেখানে যাচ্ছি, সেখানে পৌঁছোতে আমাদের কতক্ষণ লাগবে?"

লোকটি বলল, "অন্তত তিন ঘণ্টা তো বটেই। সন্ধে হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তা হলে আমি এই সময়টা ঘুমিয়ে নিচ্ছি। কাল রাত্তিরে ভাল ঘুম হয়নি। পৌঁছে গেলে আমায় ডেকে দিও।"

তারপর কাকাবাবু সত্যিই ঘুমিয়ে পড়লেন মনে হল। গাড়ির লোকগুলো এই এতটা সময় কোনো কথা বলল না, তবে তারা কেউ ঘুমোল না।

জিপটা শেষ পর্যন্ত থামতে কাকাবাবু জেগে উঠলেন নিজে থেকেই।

সন্তুকে যে বাড়িতে বন্দী করে রাখা হয়েছিল, সেই বাড়ির গেটের সামনে কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। দুজনের হাতে দাউ দাউ করে জ্বলছে মশাল। সেই আলোতে কাকাবাবু চিনতে পারলেন রাজকুমারকে।

গাড়ি থেকে নেমে এসে কাকাবাবু রাজকুমারের সামনে দাঁড়ালেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, "তা হলে আবার দেখা হল! এত শিগগিরই যে দেখা হবে তা ভাবিনি। আশা করি এবারে মারামারি করার দরকার হবে না। সন্তুর চিঠি আমি পেয়েছি। আমি জঙ্গলগড়ের ম্যাপ দিয়ে দিলে তোমরা সন্তুকে ছেড়ে দেবে। আশা করি ভদ্রলোকের মতন তোমরা কথা রাখবে। এই নাও জঙ্গলগড়ের ম্যাপ।"

জামার পকেট থেকে কাকাবাবু ম্যাপটা বার করে এগিয়ে দিলেন রাজকুমারের দিকে।

(ক্রমশ)

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

ছোটদের ছবি

অহিভূষণ মালিক

টালিগঞ্জের শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েদের ছবি আঁকা শেখাবার জন্য একটি স্কুল আছে। ছবি আঁকার স্কুল তো অনেক আছে কলকাতায়, কিন্তু অমন পরিবেশ কোথায় পাওয়া যাবে! বাগান, মাঠ, খেত, ঝকঝকে মস্ত চত্বর—চারপাশে চোখভোলানো আরও কত কিছু! ছেলেমেয়েরা ছবি আঁকে। তাদের পরামর্শ দেন অভিজ্ঞ সব শিক্ষক-শিক্ষিকা। বৎসরান্তে হয় ছবির একটি প্রদর্শনী এবং ছবি আঁকার প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতায় বসতে হলে যে শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমেরই ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে—এমন কোনও কথা নেই। যে কেউ বসতে পারে। তবে বয়স তাদের বারো বছরের নীচে হওয়া চাই। এবার প্রদর্শনী এবং প্রতিযোগিতা দুটোই দেখার সুযোগ হয়েছিল আমাদের।

প্রতিযোগিতায় সে কী উৎসাহ প্রতিযোগীদের! কী আঁকতে হবে শোনামাত্রই খুদে খুদে আর্টিস্টরা ছবি এঁকে ফেলল কাগজে। সময় দেওয়া হয়েছিল এক ঘণ্টা, কিন্তু এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবার অনেক আগেই বেশির ভাগ ছবি জমা পড়েছিল। ঐ অল্প সময়ে মধ্যে কেমন করে ওরা ছবি এঁকে ফেলেছিল—ভাবা যায় না। বেপরোয়া রঙ চাপিয়েছে, বেপরোয়া দাগ টেনেছে, একেকজনের ভাবনা-চিন্তা একেকরকম, নকল করার ধার ধারে না কেউ। এরা বড় হয়ে মস্ত মস্ত শিল্পী হতে পারে যদি বাবা-মায়েরা এদের ছবি আঁকার ঝোঁক থেকে সরিয়ে না দেন।

এঁকেছে কল্লোল দত্ত (বয়স ৭ বছর)

শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমের ছেলেমেয়েদের ছবির মান বেশ উঁচু, কিছু-কিছু ছবি তো বেশ পরিণত। ল্যাণ্ডস্কেপ, ফল-ফুল, গ্রাম ইত্যাদি ধরা পড়েছে ছবির বিষয়বস্তু হিসেবে। পুরস্কার দেবার কথা উঠলে পুরস্কার সবারই প্রাপ্য। কোনও ছবি বা আর্টিস্টের নাম উল্লেখ করছি না। উল্লেখ করতে গেলে এই কাগজের দু-পাতা ভরে যাবে তাদের নামে। কাকে ছেড়ে কার কথা বলব!

সরোজিনী নাইডুকে উত্তর-প্রদেশের রাজাপাল করা হলে তিনি বলেছিলেন, তোমরা একটি গায়ক-পাখিকে খাঁচার মধ্যে ভরে ফেলছ।

Duckback®
স্কুল ব্যাগ
MON
TUE
FRI
SAT
বেঙ্গল ওয়াটারপ্রুফ লিঃ
কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ
Duckback® মানেই সবার সেরা
naa.BWL 8311

বসু-বাড়ি

শিশিরকুমার বসু

(৭৪)

লণ্ডনে পৌঁছে দেখলাম বাবার মনের ভাবটা একেবারে বদলে গেছে। যেন বহুদিন পরে পুরনো ও চেনা এক জায়গায় ফিরে এসেছেন। কোথায় কী আছে, কী অবস্থায় আছে, কতটা বদলেছে, জানবার ও দেখবার জন্য কী কৌতূহল। লণ্ডনের উত্তরে হ্যাম্পস্টেড এলাকায় প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে ব্যারিস্টারি পড়বার সময় বাবা থাকতেন। সেই সময় তিনি প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে মাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, কত যে পিকচার পোস্টকার্ড তখন মাকে পাঠিয়েছেন তার হিসাব নেই। একদিন আমাদের সকলকে নিয়ে নিজের পুরনো দিনের সেই বাসস্থান খুঁজতে বেরোলেন। আমরা খুঁজছি তো খুঁজছিই। কিছুতেই ৮৬ সাউথ হিল পার্ক-এর বাড়ি পাওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত পাড়ার এক ভদ্রলোক আমাদের অবস্থা দেখে এগিয়ে এলেন। বাড়ির ঠিকানা জেনে নিয়ে বললেন। ও, ঐ বাড়িটা তো যুদ্ধের সময় বোমা পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

লণ্ডনে আমাদের হোটেলে সব সময়েই ভিড়। সাংবাদিকরা তো আছেনই—ভারতীয় ও বিদেশী, আছেন ছাত্র-ছাত্রীর দল। তার উপরে আছেন প্রবাসী ভারতীয়রা। কেউ ডাক্তার, কেউ আইন-ব্যবসায়ী, কেউ ব্যবসায়ী। এত ভারতীয় ইউরোপের অন্য কোনো দেশে পাওয়া যায় না। তাছাড়া আছে বেশ কতকগুলি ভারতীয় প্রতিষ্ঠান যেগুলি অনেকদিন ধরে ভারতের স্বাধীনতার সমর্থনে কাজ করে এসেছে। যেমন স্বরাজ হাউস, ইণ্ডিয়া লিগ, ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান মজলিস প্রভৃতি। প্রবাসী ভারতীয় সাংবাদিকদের ছিল ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন। একটার পর একটা সভা হতে লাগল। একটি বড় সভায় সভাপতিত্ব করলেন প্রবীণ ইংরেজ রাজনীতিবিদ ফেনার ব্রকওয়ে যিনি সারা জীবন ভারতবর্ষ ও সাম্রাজ্যবাদীদের পদানত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মুক্তির জন্য লড়েছেন। বাবা তাঁর বক্তৃতায় দেশের ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশদ আলোচনা করলেন। ইণ্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন একটি ভোজসভার আয়োজন করলেন। ইণ্ডিয়ান ওয়ার্কার্স অ্যাসোসিয়েশন ও স্বরাজ হাউসও অনুষ্ঠান করলেন। বাবা তখন দেশে একটা ঐক্যবদ্ধ বিরোধীদল গঠনের পরিকল্পনা নিয়েছেন। ঐ লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রচার করতে লাগলেন। আমাদের হোটেলেই বিদেশী সাংবাদিকদের একটা বড় কনফারেন্স হল। বাবা প্রায় দু-ঘণ্টা ধরে নানা প্রশ্নের সোজাসোজা জবাব দিলেন। প্রবাসী ছাত্রছাত্রীরা সবসময়েই বাবাকে ঘিরে থাকত, তিনিও যথাসম্ভব তাদের আপ্যায়ন করতেন।

সেই সময় লণ্ডনে ভারতের হাই কমিশনার ছিলেন কৃষ্ণ মেনন। তিনি একদিন আমাদের ইণ্ডিয়া হাউসে নেমন্তন্ন

লণ্ডনে বক্তৃতারত শরৎচন্দ্র, ১৯৪৯

করে খাওয়ালেন। ইউরোপ ভ্রমণের সময় বাবা আমাদের বিদেশী দূতাবাসগুলির, বিশেষ করে লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসের, খোলাখুলিভাবে তীব্র সমালোচনা করছিলেন। সে জন্য ইণ্ডিয়া হাউসে খাওয়াদাওয়া ও কথাবার্তার সময় আমরা সকলেই যেন একটু আড়ষ্ট হয়ে ছিলাম। বাবা খবর পেয়েছিলেন যে বিদেশে আমাদের কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক কাজকর্মে নানারকম দুর্নীতি দেখা যাচ্ছে। তিনি দাবি করছিলেন যে, ভারত সরকার যেন ঐ বিষয়ে ভাল করে অনুসন্ধান চালিয়ে প্রতিবিধানের ব্যবস্থা নেন।

লণ্ডনের পাশেই ইসলিংটনের শহরগুলির মেয়র বেশ বড় রকমের একটা সম্বর্ধনা-সভার আয়োজন করেছিলেন। প্রবাসী অনেক ভারতীয় ও ভারতবন্ধু ইংরেজরা সভায় উপস্থিত ছিলেন। লণ্ডনপ্রবাসী এক ভারতীয় ডাক্তার তেজ কিষেন কাউল বাবার লণ্ডনের অনুষ্ঠানসূচী সফল করতে বড় ভূমিকা নিয়েছিলেন। শেষে সাব্যস্ত হয় যে, বাবার নেতৃত্বে ইংল্যাণ্ডে ভারতীয়দের একটা দল সক্রিয়ভাবে কাজ করবে এবং দেশের অগ্রগতির জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করবে।

নেশন পত্রিকার জন্য ইউরোপে ও আমেরিকায় সংবাদদাতা নিয়োগ করার কাজটা বাবা ইউরোপ ভ্রমণের সময় সেরে ফেলতে চেয়েছিলেন। ইউরোপ থেকে নাম্বিয়ারসাহেব লিখবেন আগেই ঠিক হয়েছিল। লণ্ডন ও ওয়াশিংটনের দুজন সংবাদদাতা লণ্ডন ছাড়বার আগেই বাবা ঠিক করে ফেললেন।

দেশে ফেরার পরে বাবা আমাকে নেশনের ফরেন করেসপনডেণ্ট নিযুক্ত করেন। আমার মনে হয়, সাংবাদিকতায় আমাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্যই এটা করেছিলেন। এই সূত্রে আমার বিশেষ রকমের একটি অভিজ্ঞতা হয়। বাবারই নির্দেশে আমি একবার প্যারিসে একটি আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সম্মেলনে যাচ্ছি, সঙ্গে আছেন আনন্দবাজারের প্রতিনিধি তারাপদ বসু। ইংলিশ চ্যানেল পার হবার জন্য জাহাজে উঠেছি। দুই ভদ্রলোক জাহাজে উঠে এসে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন। কোটের পকেট থেকে তাঁদের পরিচয়পত্র বের করে দেখিয়ে বললেন, তাঁরা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দা দফতর থেকে আসছেন। আমি কোথায় যাচ্ছি, কতদিন থাকব ইত্যাদি জানতে চাইলেন। আমার সঙ্গী তারাপদবাবু ব্যাপারটা ঘটায় বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। আমি ভেবেছিলাম বিলেতে এসে আমি বোধহয় পুলিশের দৃষ্টির বাইরে চলে গেছি। দেখলাম, আসলে তা নয়।

বাবার দেশে ফেরার দিন এসে পড়ল। লণ্ডনে আমার থাকার ব্যবস্থা নিয়ে বাবা ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আমি ভাবলাম এ-কাজটা তো আমি লণ্ডনের বন্ধুদের সাহায্যেই করতে পারি। বাবা কিন্তু আমাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি খুঁজতে বেরোলেন। লণ্ডনে ভারতীয় ছাত্ররা সাধারণত একটি বিশেষ এলাকায় দল বেঁধে থাকতেন এবং জীবনযাত্রার ধারাটা ঠিক দেশের মতো রাখার চেষ্টা করতেন। বাবার কিন্তু মত ছিল—In Rome, do as the Romans do! তিনি বললেন, ইংরেজদের বা নতুন কোনো দেশের সামাজিক জীবনের সঙ্গে ভাল যোগাযোগ না হলে, তাদের ভাল যা কিছু দেবার আছে তা নিতে না পারলে, বিদেশে গিয়ে কী লাভ? বাবা ঠিক করলেন যে, ভারতীয় কলোনির অনেক দূরে কোনো ভাল ইংরেজ পরিবারের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা করে যাবেন। করলেনও তাই। নিজে ছাত্রজীবনে যে অঞ্চলে ছিলেন তারই কাছাকাছি হ্যাম্পস্টেডে এক বৃদ্ধা ইংরেজ মহিলার হেফাজতে আমাকে রেখে গেলেন। খরচাও বেশি। হাসপাতাল থেকেও দূর, কিন্তু বাবা শুনবেন না। মহিলাটি ছিলেন গোঁড়া ইংরেজ কিন্তু আমাকে ঠিক ঠাকুমার মতো দেখাশুনো করতেন। মধ্যবিত্ত ইংরেজ সমাজের অনেক কিছু ভাল ও মন্দ আমি তাঁর কাছ থেকে জানতে পেরেছিলাম।

বাবা মা ও দুই বোনকে নিয়ে প্যারিস, রোম ও কাইরো হয়ে দেশে ফিরলেন। আমার জীবনে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল।

ফেরবার পথে প্যারিসে বাবা ১৯৪১ সালে কাবুলের ইতালীয় দূত কোয়ারোনির কাছ থেকে কিছু পুরনো তথ্য ও দলিল পেলেন। ১৯৪১ সালের মে মাসে বার্লিন থেকে কাবুলে পাঠানো রাঙাকাকাবাবুর একটি গোপন বার্তার কপি কোয়ারোনির কাছে ছিল। বার্তাটিতে বাবার জন্য জরুরি

ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে শরৎচন্দ্র বসু, ১৯১৩

খবর ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি কিছু জানতে পারেননি। কাবুলে যাঁদের হাতে বার্তাটি পৌঁছেছিল তাঁরা রাঙাকাকাবাবুর নির্দেশগুলি পালন করেছিলেন কি না তাও বাবা জানতে পারেননি।

আমি বিলেতে থাকার সময় বাবা আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখতেন, তা তিনি যতই ব্যস্ত থাকুন না কেন। আমার পড়াশুনোর ব্যাপার ছাড়াও তিনি তাঁর রাজনৈতিক কাজকর্মের কথা জানাতেন এবং নানারকম কাজের ভার দিতেন। বিশেষ বিশেষ লোক বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। বাবারই কাজে পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ও ইংরেজ রাজনীতিবিদের সঙ্গে আমার আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল। বাবা চীনের বিপ্লব সম্বন্ধে খুবই আগ্রহী ছিলেন। সেই সময় মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে চীনের কমিউনিস্ট দল ক্ষমতা দখলের দিকে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু সেই দেশের খবরাখবর আমাদের দেশে সরাসরি পাওয়া যেত না। নিউ চায়না নিউজ এজেন্সি লণ্ডন অফিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নেশন পত্রিকার জন্য অন্তর্বিপ্লবের খবরাখবর দেশে নিয়মিতভাবে পাঠাবার আমি ব্যবস্থা করি।

১৯৪৯-এর প্রথম মাস-তিনেক লণ্ডনে থাকবার পরে কাজ শেখার ভাল সুযোগ পাওয়ায় আমি মধ্য ইংল্যাণ্ডের শেফিল্ডে চলে যাই এবং সেখানকার শিশু হাসপাতালে যোগ দিই। সেই সময় মনে হত যেন বসুবাড়ি থেকে আমি অনেক দূরে চলে গেছি। দেশে বা বাড়িতে যা কিছু ঘটছে সবই যেন আবছা-আবছা মনে হত। আমরা জনা-চারেক ভারতীয় ডাক্তার একসঙ্গে পড়াশুনো করতাম। আরও দু-চার জন শিক্ষার্থীকে নিয়ে আমাদের একটা ছোট গোষ্ঠী। নিজেদের সুখ-দুঃখ ভাগাভাগি করে নিয়ে আমাদের দিনগুলি মোটামুটি স্বচ্ছন্দেই কেটে যেত।

হঠাৎ একদিন খবর পেলাম বাবার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। ভাবতে লাগলাম আমার হয়তো বাড়ি ফিরে যাওয়াই উচিত। বাবা কিন্তু বারবার আমাকে জানাতে লাগলেন, আশঙ্কার কোনো কারণ নেই, আমি যেন আমার কাজ শেষ করার আগে দেশে ফেরার কথা চিন্তাও না করি। আমার ইচ্ছে ছিল বছর-চারেক ইউরোপে থাকব, দু-বছর ইংল্যাণ্ড এবং বাকিটা মধ্য ইউরোপের কোনো দেশে। রাঙাকাকাবাবুই তো বলে গিয়েছিলেন, ইংল্যাণ্ড - ইউরোপ নয়, আমাদের মধ্য ইউরোপের সভ্যতা ও কৃষ্টির সঙ্গে যোগাযোগ করা একান্ত প্রয়োজন। যাই হোক, ঐ ধরনের ভাবনা আমি সেই মুহূর্তে ত্যাগ করবার জন্য প্রস্তুত হলাম। অন্যদিকে বাবার স্থির বিশ্বাস, তিনি ভাল হয়ে উঠবেন। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে লিখলেন—I have many more years to live and work।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

নিউইয়র্কে বার্নার্ড শ'র একটি নাটক খুব সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হবার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা এল। তিনি জবাব পাঠালেন, আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন কেন? আমি তো লেখার সময়ই এমনভাবে লিখেছি যাতে সাফল্য নিশ্চয় আসবে।

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

রোভার্সের রয়
রোভার্সকে উয়েফা কাপ জিতিয়ে দিয়ে রয় সপরিবারে বসরানে এসেছে...
ওরেব্বাস, রেড কার্পেট কার জন্যে ?
মনে হচ্ছে...
...তোমারই জন্যে !
হুররে !
সে কী !
বসরানের শেখ স্বয়ং বিমানবন্দরে হাজির...
এ যে দারুণ অভ্যর্থনা !
তা আপনিও তো একজন দারুণ অতিথি
রয় রেস !
মধ্যপ্রাচ্যের ফুটবলে আমরা বড্ডই পিছিয়ে আছি ! আমাদের এগিয়ে দিন !
কাজটা শক্ত হবে
এই তো রয় !
রয় দি গ্রেট !
এরা ভাবছে, আমি জাদু জানি !
রয়ের জন্য তৈরি রয়েছে বিশাল বাড়ি !
আজ বিশ্রাম নিন । কাল জাতারের বিরুদ্ধে আমাদের খেলা !
মধ্যপ্রাচ্যে আমরা সেরা দল বলে গণ্য হতে চাই !
সময় লাগবে !

বাচ্চারা জলে নেমেছে !
এসো রয় !
দুঃখিত !
আমাকে মাঠে যেতে হবে ! গাড়ি এসেছে !
শহর ছাড়িয়ে এগোচ্ছে গাড়ি...
কেমন লাগছে
দারুণ ! চমৎকার স্পোর্টস সেণ্টার !
স্টেডিয়ামে ঢুকতেই...
রয় !
রয় !
মানুষ দিয়ে অক্ষর বানিয়েছে !
ROY RACE
স্বাগত রয় !
রয়ের গোল দিয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন...
চমৎকার গোল !
শুভ প্রতীক !
শুরু হল খেলা...
বসরান ! বসরান !
স্বস্তি পাচ্ছি না ! মাঠের ধারে বসাই ভাল ছিল !
ধুত ! বসরান দেখছি অতি রদ্দি টিম !
খানিক বাদেই...
জাতার গোল দিয়েছে ! কী লজ্জা !
এত বাজে দলকে আমি গড়ে তুলব কীভাবে ?
(এর পরে আগামী সংখ্যায়)
পড়া কি সত্যি সম্ভব

আশ্চর্য চুরি

নিরঞ্জন সিংহ

অফিসে ঢুকতেই সম্পাদকমশায় সুখবরটি জানালেন। জেনিভায় যে আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলন হচ্ছে সেই সম্মেলনের খবর সরবরাহের জন্য আমাকে মনোনীত করা হয়েছে। কলকাতার বিখ্যাত এক বাংলা দৈনিকের আমি বিজ্ঞান-সাংবাদিক। জেনিভার সম্মেলন সম্পর্কে আমি খুবই আগ্রহী ছিলাম। খুবরটা শুনে তাই মনে-মনে খুশিই হলাম।

ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ সদাশিব মুখার্জি এই সম্মেলনে আহূত হয়েছেন—সে-খবর আগেই জানতাম। ডঃ মুখার্জি একজন জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিশেষজ্ঞ। বিজ্ঞানের এই নতুন শাখায় ডঃ মুখার্জির অবদানের কথা পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। বংশগতির ধারা নিয়ন্ত্রণ করে যে বস্তুটি, তার অবস্থান দেহের কোষের মধ্যে। চেহারা তার প্যাঁচানো মইয়ের মতো। নাম তার ডি. এন. এ.। এই ডি. এন.এ-র অংশকে বলে জিন। এই জিন কাটা-ছেঁড়া করে নতুন জিন সৃষ্টি করতে পারলে নতুন জ্যাতের মানুষ সৃষ্টি সম্ভব বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

ডঃ মুখার্জি এমন এক পদ্ধতিতে নতুন ধরনের জিন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন যে, ইচ্ছে করলে তিনি উন্নত শ্রেণীর বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক, অফিসের কেরানি, শ্রমিক অথবা সৈনিক তৈরি করতে পারেন।

কিছু-কিছু বিজ্ঞানের পত্র-পত্রিকায় এ-কথা প্রকাশ হতেই সারা পৃথিবীতে বিতর্কের ঝড় শুরু হয়ে গেছে। ডঃ মুখার্জি অবশ্য জানেন যে, এই ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাল দিক যেমন আছে, তেমনি খারাপ দিকও আছে। কোনো সরকার যদি মনে করে যে, দেশে বুদ্ধিমান মানুষ তৈরির কোনো প্রয়োজন নেই কারণ, তারা সরকারের ভুলত্রুটি নিয়ে সমালোচনা করবে এমনকী প্রয়োজন হলে সরকারকে উৎখাতও করতে পারে, তাহলে তো সেই সরকার কম বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তৈরি করবে এবং তারা সরকারের সব নির্দেশ বিনা বিচারে মেনে নেবে।

বহু বিদেশী সরকার ডঃ মুখার্জির জিন তৈরির পদ্ধতি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। বহু গ্রাণ্ট ও বড় বড় চাকরি ও সুযোগ-সুবিধার প্রলোভনও দেখানো হয়েছে ডঃ মুখার্জিকে; কিন্তু এই একগুঁয়ে জাতীয়তাবাদী বৈজ্ঞানিককে কেউ লোভ দেখিয়ে নিজের দেশে নিয়ে যেতে পারেনি। ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে গিয়ে গবেষণা করাকে ঘৃণা করেন ডঃ মুখার্জি।

এই বিতর্কিত বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে কী বলেন তা জানার আগ্রহ রয়েছে অন্যান্য দেশের বৈজ্ঞানিকদের। ওঁর কাছ থেকে আসল তথ্য আদায় করে নেওয়া অন্যান্য দেশের বিজ্ঞানীদের পক্ষে সম্ভব হবে কি? এইরকম একটা সম্মেলনের খবর পাঠাবার দায়িত্ব পেয়ে আমি খুব খুশি।

ডঃ মুখার্জির সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপ ছিল। ফোনে জানালাম যে, আমি আমাদের বাংলা দৈনিকের তরফ থেকে জেনিভা যাচ্ছি। ডঃ মুখার্জি খুশি হলেন খবরটা পেয়ে। দমদম বিমানবন্দরে নির্দিষ্ট দিনে দেখা হল ডঃ মুখার্জির সঙ্গে। রাশভারী লোক। বিমানে পাশাপাশি সিট পড়লেও দু-চারটের বেশি কথা হল না।

জেনিভায় পৌঁছে ডঃ মুখার্জির সঙ্গে একই হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করে নিলাম।

পাশাপাশি ঘরও পাওয়া গেল। সম্মেলন শুরু হতে দুদিন দেরি। ডঃ মুখার্জির এক পুরনো বন্ধু ওঁকে ফোনে ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালেন। ডঃ মুখার্জি আমাকেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন; কিন্তু আমার শরীরটা খারাপ হওয়ায় গেলাম না। সন্ধ্যার একটু পরে ডঃ মুখার্জির বন্ধু গাড়ি নিয়ে চলে এলেন ওঁকে নিয়ে যাবার জন্য। আমি ডঃ মুখার্জিকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। খাওয়া-দাওয়া সেরে বিছানায় শুয়ে একটা ম্যাগাজিনের পাতা ওলটাচ্ছিলাম। নতুন জায়গায় চট করে আমার ঘুম আসে না। রাত দশটা-নাগাদ একটা ফোন এল ডঃ

মুখার্জির বন্ধু ডঃ সামোয়ার কাছ থেকে। ডঃ মুখার্জি নাকি চেয়ার থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় একটু চোট পেয়েছেন। চিন্তার কোনো কারণ নেই। তবে আজ রাত্তিরে তিনি আর হোটেলে ফিরবেন না। আমি যেন চিন্তা না করি।

ব্যাপারটা একটু অস্বাভাবিক মনে হলেও আমি আর ও-নিয়ে মাথা ঘামালাম না। এপাশ-ওপাশ করতে-করতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল আটটা-নাগাদ ডঃ মুখার্জি ফিরে এলেন। মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল ওঁকে। জিজ্ঞেস করলাম, "কেমন আছেন ?"

বললেন, "ভালই আছি, তবে একটু ক্লান্ত লাগছে।"

সেদিন আর কোথাও বেরুলেন না ডঃ মুখার্জি। সারাদিন প্রায় ঘুমিয়েই কাটালেন। পরদিন ওঁকে বেশ সুস্থ বলেই মনে হল। আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। বিকেলের দিকে দুজনে শহরে একটু ঘোরাঘুরিও করলাম।

পরদিন সম্মেলন শুরু হল। আমি ডঃ মুখার্জির সঙ্গে কনফারেন্স হলে গিয়ে পৌঁছলাম। আজই ডঃ মুখার্জির বক্তৃতা আছে। দেখলাম ডঃ মুখার্জির বক্তৃতা শোনার জন্য সবদেশের বিজ্ঞানীরা খুবই আগ্রহী। এক সময় ডঃ মুখার্জি বক্তৃতা দিতে উঠলেন। কনফারেন্স হল নিস্তব্ধ।

ডঃ মুখার্জি শুরু করলেন। কিন্তু কোনো বিজ্ঞানের বিষয় নিয়ে আলোচনার বদলে উনি বলতে শুরু করলেন, "বন্ধুগণ, আমি জানি আপনারা আমার কাছ থেকে নতুন কিছু শোনার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন। আমি তার জন্য গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানে ভারত একদিন সারা বিশ্বের পথিকৃৎ ছিল—অবশ্য এ-কথা আজ কেউ স্বীকার করতে চান না। এমনকী বিদগ্ধ ভারতীয়দের মধ্যেও অনেকে এ-কথা বিশ্বাস করেন না। অনেকের ধারণা, নিজের দেশকে বড় করে দেখানোর লোভে আমরা এ ধরনের অপপ্রচার করে থাকি। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয়। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ মহাকাশবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা, ভেষজবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা ইত্যাদি বিজ্ঞানে যথেষ্ট উন্নত ছিল। শুধু তাই নয়, মানুষের জ্ঞানের চরম বিকাশ যে দর্শনশাস্ত্রে সেই দর্শনশাস্ত্রেও ভারত ছিল অগ্রণী। এসব কথার কথা নয়, এর প্রমাণ আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রসমূহ। আজ ইউরোপ, আমেরিকা বিজ্ঞানে উন্নতি করেছে, কিন্তু ভারত যে এখনও বিশ্বের দরবারে কিছু দিতে পারে সে-কথা আজ আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন। বন্ধুগণ, যে-কথা জানতে আপনারা আগ্রহী সে-কথা এই মুহূর্তে আমি আপনাদের জানাতে পারছি না বলে ক্ষমা করবেন। আমি পৃথিবীর সব দেশের সরকারকে অনুরোধ জানাচ্ছি—তাঁরা যদি শপথ করে বলেন যে, এই পদ্ধতি একমাত্র মানবকল্যাণে লাগানো হবে, ক্ষমতার লোভে তাঁরা এই পদ্ধতির অপব্যবহার করবেন না তাহলেই আমি সবকিছু প্রকাশ করব। তা না হলে আমি আমার গবেষণার কাগজপত্র সব নষ্ট করে ফেলব।"

ডঃ মুখার্জির ভাষণ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে সারা কনফারেন্স হল ভরে উঠল গুজগুজ-ফুসফুসে। একজন চেঁচিয়ে উঠলেন, "কোনো বৈজ্ঞানিক সত্য চেপে রাখার অধিকার কারও নেই।" একজন বৈজ্ঞানিক বললেন, "ডঃ মুখার্জি তামাম দুনিয়ার সরকারকে ব্ল্যাকমেল করার চেষ্টা করছেন।"

পরদিন ডঃ মুখার্জির কোনো বক্তৃতা ছিল না। আমরা পাশাপাশি চেয়ার দখল করে বসলাম। সম্মেলন শুরু হতেই ঘোষক জানালেন, "বন্ধুগণ, আমি আজ আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, ডঃ রবার্ট আপনাদের সামনে এমন একটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করবেন যে-সম্পর্কে আপনারা অত্যন্ত আগ্রহী। ডঃ রবার্ট বহুদিন ধরে

জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে গবেষণা করছেন। তিনিও ডঃ মুখার্জির মতোই নতুন জিন সৃষ্টি করতে পেরেছেন। তার বিশদ বিবরণ আপনারা ডঃ রবার্টের মুখ থেকেই শুনুন।"

ঘোষণা শেষ হতে না হতে চমকে উঠলেন ডঃ মুখার্জি। তারপর ফিসফিস করে আমাকে বললেন, "আশ্চর্য। কে এই ডঃ রবার্ট। এর নাম তো কখনো শুনিনি। কোন্ দেশের বৈজ্ঞানিক ইনি ?"

পুরো ব্যাপারটা আমার কাছেও বেশ রহস্যময় বলে মনে হল। লক্ষ করলাম কনফারেন্স হলের বৈজ্ঞানিকরা সবাই একটু অবাক হয়ে মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আছেন। বৈজ্ঞানিক মহলে এই ডঃ রবার্ট খুব একটা পরিচিত মানুষ বলে মনে হল না।

ডঃ রবার্ট মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। বয়স বছর-পঁয়তাল্লিশ, বেশ ব্যক্তিত্বপূর্ণ চেহারা। ভদ্রলোকের মাথায় একটা ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। সেদিকে ডঃ মুখার্জির দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম আমি। ডঃ মুখার্জি চেয়ারে একটু নড়েচড়ে বসলেন। মনে হল, উনি কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছেন।

ডঃ রবার্ট শুরু করলেন, "বন্ধুগণ, আমি জানি আপনারা আমার কাছ থেকে নতুন কিছু শোনার জন্য আগ্রহভরে অপেক্ষা করছেন। আমি তার জন্য গৌরবান্বিত। বিজ্ঞানে ভারত একদিন...।"

আমি চমকে উঠলাম। এ যে হুবহু ডঃ মুখার্জির ভাষণ শুনছি। অদ্ভুত ব্যাপার। ভদ্রলোকের কি মাথা খারাপ ? সম্মেলনের কর্মকর্তারাই বা কী করে ওঁকে বক্তৃতা-মঞ্চে উঠতে দিলেন !

গতকাল ডঃ মুখার্জি যে কথা বলে ভাষণ শেষ করেছিলেন ডঃ রবার্টও সেই কথা বলে তাঁর বক্তৃতা শেষ করলেন। নতুন জিন তৈরির কোনো কথাই তিনি আলোচনা করলেন না।

কনফারেন্স হলে প্রচণ্ড শোরগোল উঠল। হঠাৎ ডঃ মুখার্জি আমার হাত ধরে আচমকা টান দিয়ে চাপা স্বরে বললেন, "শিগগিরি এখানে থেকে বেরিয়ে এসো।"

ডঃ মুখার্জির সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম। কেউ আমাদের লক্ষ করেছে বলে মনে হল না। বাইরে এসে ট্যাক্সি ধরে হোটেলে। তাড়াতাড়ি বিল মিটিয়ে সেই ট্যাক্সিতেই সোজা এয়ারপোর্ট। ডঃ মুখার্জিকে কোনো প্রশ্ন করারও ফুরসত পেলাম না।

প্লেনে উঠে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন ডঃ মুখার্জি। প্লেন তখন রানওয়ে ধরে ছুটতে শুরু করেছে। আমি ডঃ মুখার্জির দিকে ফিরে বললাম, "ব্যাপারটা আমাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন কি ?"

ডঃ মুখার্জি আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে এসে ফিসফিস করে বললেন, "ওরা আমার মগজের 'স্মৃতিকোষ' বের করে নিয়ে ওই ডঃ রবার্টের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে। ডঃ সামোয়া সেদিন হোটেলে নেমন্তন্ন করে আমাকে অজ্ঞান করে এই কীর্তিটা করেছে। ভেবেছিল এইভাবে নতুন জিনের কথা ফাঁস করে দেবে। কিন্তু আমার মনে তখন একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছিল। তা হচ্ছে নতুন জিন তৈরির কথা কিছুতেই ফাঁস করব না। তার বদলে সম্মেলনে কী বলব তাই আমার সমস্ত মন জুড়ে ছিল। তাই 'স্মৃতিকোষ' বের করে নিয়ে ওদের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। সুতরাং এবার ওরা হয়তো আমাকে সরাসরি আক্রমণ করত ! তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ওখান থেকে পালালাম।"

ডঃ মুখার্জির কথা শুনে ব্যাপারটা পরিষ্কার হওয়ার বদলে আরও যেন ধাপসা হয়ে উঠল। স্মৃতিকোষ একজনের মগজ থেকে অন্যের মগজে ঢুকিয়ে দেওয়া কি সম্ভব ? সম্ভব না হলে ডঃ রবার্ট কী করে ডঃ মুখার্জির ভাষণটা হুবহু বলে গেলেন ?

আমি আর কিছু ভাবতে পারছিলাম না। প্লেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকালাম। জানলার বাইরে ঘন ছাই রঙের মেঘ।

ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

আমার ডাক শুনতে পাচ্ছ ? ...কুউ...কুউ...
হ্যালো প্রোফেসর...টিনটিন বলছি...ক্যাপ্টেন এই রকেট থেকে দশ গজ দূরে ভাসছে। ওকে ফেরাবার চেষ্টা করছি...
চেষ্টা চালাও !
কী, ওই ঘুপচি-ঘরে ফিরব ? কভি নেহি ! ...কুউ...কুউ...
এই রে !
ক্রমেই দূরে সরে যাচ্ছে !
সর্বনাশ ! অ্যাডোনিস ওকে টানছে !
হ্যালো প্রোফেসর...অ্যাডোনিসের টানে ক্রমেই ক্যাপ্টেন দূরে সরে যাচ্ছে যে !
তবেই তো গণ্ডগোল ! আর উপায় নেই !
কী করব ?
পৃথিবীকে জানাব যে, ক্যাপ্টেন এখন অ্যাডোনিসের উপগ্রহে পরিণত হয়েছে !
প্রোফেসর, রকেটের গায়ের সিঁড়িটাকে একটু জাগিয়ে দিন, তারপর মোটরটাকে চালু করে গতিবেগ ক্রমশ বাড়াতে থাকুন...
তাতে লাভ কী হবে ?
ক্যাপ্টেনের কাছে গিয়ে দড়ি ছুঁড়ে দেব।
ও-সব চলবে না !
চেষ্টা করে দ্যাখো যদি কিছু হয়।
টিনটিন বলছি...মোটর চালু করুন !
মইটাকে শক্ত করে ধরে থেকো...
?
ধরে আছি... গতি বাড়িয়ে দিন...

(এর পরে আগামী সংখ্যায়)

"বালো বালো, শক্ত
দানার টুথ পাউডার
আপনার দাঁত ও মাড়ির
ক্ষতি করতে পারে…"

কোলগেট টুথ পাউডার দিয়ে আপনার দাঁত ও মাড়ি রক্ষা করুন – সেইসঙ্গে মুখের দুর্গন্ধও বন্ধ করুন!

কোলগেট টুথ পাউডার একেবারে মিহি আর সাদা। তাই আস্তে আস্তে মাড়ি ঘষার সময় এর ঝকঝকে করার মৃদু উপাদান দাঁতের ওপরকার ময়লা তুলে ফেলে আপনার দাঁতকে করে তোলে পরিষ্কার ধবধবে সাদা। কোলগেটের ঘন ফেনা আপনার দাঁতের ফাঁকে-ফোকরে ঢুকে দুর্গন্ধ ও ক্ষয়কারী রোগজীবাণুগুলোকে নষ্ট করে ও মুখের দুর্গন্ধ দূর করে।

আপনার পরিবারের সকলে এই আধুনিক উপায়ে দাঁত ও মাড়ি সুরক্ষার জন্যে নিয়মিত কোলগেট টুথ পাউডার ব্যবহার করুন। পিপারমেন্টের মত এর ঠাণ্ডা আমেজভরা স্বাদ ওদের খুবই ভাল লাগবে।

TP.G.30 BN

রুআহা

বুদ্ধদেব গুহ

আগে যা ঘটেছে: পুব আফ্রিকায় পশু-চোরাইচক্রের সন্ধানে এসেছে ঋজুদা, রুদ্র ও তিতির। পুরনো শত্রু ভুষুণ্ডার দেখা মিলেছে। আরুশার হোটেলে আচমকা হত্যাকাণ্ড। নাইরোবি-সর্দার ও দুই সাহেবের সঙ্গে ঋজুদার গোপন পরামর্শ। ওয়ানাবেরি নামে এক নিগ্রোর দম-বন্ধ-করা কাহিনী। গোপন অভিযানে ওরা রুআহা ন্যাশনাল পার্ক পেরিয়ে পাহাড়ি অঞ্চলে তাঁবু ফেলে। সেখানে নানান উৎপাত। পরদিন তাঁবু গুটিয়ে আর-এক পাহাড়ে গিয়ে সিংহের গুহায় ডেরা বাঁধে। সেখানে পিছু-নেওয়া তিন আততায়ী ঋজুদার পিস্তলের গুলিতে প্রাণ হারায়। তাদের মৃতদেহগুলো তাদেরই জিপে তুলে দূরে রেখে আসে রুদ্র। গোপন গুহায় দু দিন কেটে যায়। রোজ সকালে তিনজনে তিন দিকে বেরিয়ে চোরাশিকারিদের গতিবিধি বোঝবার চেষ্টা করে। দেখে, উত্তরের পাহাড়শ্রেণীর দিকে কুলিরা মোট বয়ে নিয়ে যাচ্ছে; সেদিকে ধোঁয়াও দেখা যায়। তবে কি ওখানে পোচারদের ক্যাম্প আছে? তৃতীয় দিন বিকেলে তিনজনই তিন দিকে তিনটে জিনিস কুড়িয়ে পায়। রুপোর কাস্ক, দামি ছুরি আর সুগন্ধি-মাখা রুমাল। তিনটেতেই লেখা আছে এস ডি। এগুলো কার? কাস্কের তরল পদার্থের ঘ্রাণ নিয়ে ঋজুদা শুধু বলে, আশ্চর্য! সে কি আঁচ পেয়েছে কিছুর?

॥ ২১ ॥

আকাশের তারাদের নিয়ে কত সব সুন্দর সুন্দর গল্প আছে আমাদের দেশে। কী সুন্দর সুন্দর সব নাম তাদের। আমার ইংরেজি নামগুলো ভাল লাগে না। বাংলা নামগুলো সত্যিই ভারী সুন্দর। তন্ময় হয়ে তারা দেখতে দেখতে পটভূমির ভয়াবহতার কথা পুরোপুরি ভুলেই গেছিলাম। এই-ই আমার দোষ। এই জন্যেই মা ঠাট্টা করে বলে, কপি-রুদ্র। ভিড়ের মধ্যে থেকেও মনে মনে কোথায় যে উধাও হয়ে যাই মাঝেমাঝেই। নিজেই জানি না।

হঠাৎ নীচে থেকে কে যেন হেঁড়ে গলায় বলল, "হেই কিড্। ডোনট শুট্। হোল্ড ইওর গান্।"

ব্রহ্মতালু জ্বলে গেল। ভয়ও পেলাম কম না। কার এত দুঃসাহস যে, আমাকে কিড্ বলে? আর আমার চোখ এড়িয়ে গুহার নীচে মানুষটা এলই বা কী করে? ওর কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আমি রাইফেল তুলেছিলাম আওয়াজটার দিকে। ব্যারেলের সঙ্গে লাগানো টর্চের বোতাম টিপতে গিয়েও কী ভেবে টিপলাম না। বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ্।"

লোকটা তেমনিই হেঁড়ে ডোন্ট-কেয়ার গলায় হেসে উঠল। অন্ধকারে পাহাড়ের গুহায় গুহায় তার হাসি খাঃ খাঃ খাঃ করে আমাকে অপমান করতে লাগল।

আবার বললাম, "হ্যাণ্ডস্ আপ। উ্য লাউজি ফুল্।"

লোকটা তবুও হাসি থামাল না। বলল, "মাই হ্যাণ্ডস্ ফুল্। উ্য রিয়্যাল ফুল্।" বলেই বলল, "টাঁড়বারো।" দেখেছ! কী ইডিয়ট, কোড ওয়ার্ডটা আগে তো বলবে! যদি ইতিমধ্যে গুলি করে দিতাম!

টাঁড়বারো কথাটা অদ্ভুত শোনাল ওর মুখে—অনেকটা 'ঠাঁশবাড়ো' গোছের

আমিও বললাম, "টাঁড়বারো।" বলেই রাইফেল নামিয়ে নিলাম। ততক্ষণে ঋজুদা ও তিতিরও বাইরে এসে পড়েছে। ওরা বোধহয় এতক্ষণ আড়ালে থেকে কথাবার্তা শুনছিল।

তিতির লাফাতে লাফাতে নীচে নামতে লাগল আমার পেছন পেছন। মুখে বলল ডামুকে, "মানে নো ইয়া ফুরাহা !" মানে, 'আহা, তোমার কথা শুনে কী খুশিই হলাম।'

ডামু হেঁড়ে গলায় হেসে আমাদের দুজনের পিঠে দুই বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় কষিয়ে বলল, "ওয়াটোটো ওআংগু ওআভাগো।" অর্থাৎ, 'ওরে আমার ছেলেমেয়েরা !' খুঞ্চুমুনু, পুঞ্চুমুনুটা আর বলল না।

ঋজুদা গুহার মুখেই বসে পাইপ খাচ্ছিল। ওখান থেকে বলল, "ডামু, তোমার সঙ্গের বন্ধু এতক্ষণ কী খাচ্ছিল ? জল ?"

"হি ড্রিঙ্কস নো ওয়াটার। হি ড্রিঙ্কস সামথিং রাঙ্গি ইয়াকে নিয়েকুণ্ডু কামা ডামু।" মানে, যার রঙ রক্তের মতো লাল।

ঋজুদা সঙ্গে সঙ্গে রুপোর কাস্কটা হাতে নিয়ে দৌড়ে নেমে এল। ডামুর পাহাড়প্রমাণ শরীরের পেছনে যে অন্য একজন লোক হাত-পা পিছমোড়া অবস্থায় মাটিতে পড়ে আছে তা আমরা কেউই এতক্ষণ লক্ষ করিনি। ঋজুদার সঙ্গে আমরাও তার কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। লোকটার নাক ফেটে রক্ত পড়ে শুকিয়ে কশ বেয়ে জমে ছিল। ডামু বোধহয় ঘুষিটুসি মেরেছে। আমাদের দেখেই ধড়ফড়িয়ে উঠে বসল। ঋজুদার দিকে বোকা-বোকা চোখে তাকিয়ে থাকল।

ঋজুদা জিজ্ঞেস করল, "কী নাম আপনার ?"

"সার্গেসন ডবসন।"

"হুঁ।"

লোকটি এবার হাসল ঋজুদার দিকে চেয়ে। ইংরেজিতে বলল, "আমাকে চিনতে পারলে না মিস্টার বোস ? সেই লণ্ডনের টিরুলার হট্ রেস্তোরাঁতে দেখা হয়েছিল তোমার সঙ্গে, টম ম্যাকআইভর-এর সঙ্গে। মনে পড়ে ? চার-পাঁচ বছর আগের কথা।"

"মনে পড়ে। কিন্তু আপনি এখানে কী করছিলেন ?"

"সইই ! আপনিই তো বলেছিলেন লেক লাগাজাতে সিলিকা রিফ্‌ট ভ্যালিতে হেমাটাইট্ ডলোমাইট ; সেই অবধি প্রফেসর লিকির সঙ্গে সব সংস্রব ছেড়ে দিয়ে এইই করে বেড়াচ্ছি। হিঁ-হিঁ।"

লোকটা ল্যাজেগোবরে অবস্থাতেও স্মার্ট হবার চেষ্টা করল। নাকে ঘুষি খাওয়াতে সব শব্দের আগে একটি করে চন্দ্রবিন্দু অনিচ্ছাকৃতভাবে যোগ হয়ে যাচ্ছিল। ডামু হঠাৎ ওর পিছনে এক লাথি মেরে লোকটাকে উল্টে ফেলে দিল। পড় তো পড় একেবারে নাক নীচে করেই। হাঁউমাউ করে বিশুদ্ধ ইংরেজিতে কেঁদে উঠল লোকটা।

ঋজুদা বাংলায় বলল, "রুদ্র, ওকে খেতে দে। তবে ও এখানেই থাকবে। একটা ত্রিপল বের করে দে গাড়ি থেকে। বাঁধনও খুলবি না। ডামুকে বলিস, যেন আর মারধোর না করে।" এই বলে ডামুকে নিয়ে গুহার দিকে উঠে গেল ঋজুদা।

আমি লোকটাকে সোজা করে

বসালাম। তিতির গেল ওর জন্যে খাবার আনতে। আমি যখন জিপ থেকে ত্রিপল নামাচ্ছি, তখন লক্ষ করলাম, লোকটা এক দৃষ্টিতে আমার মুখে তাকিয়ে আছে। রোগা-পটকা একজন জ্ঞানী-গুণী সাহেব। দেখে মনে হয়, প্রফেসর বা কবি। ঋজুদা এর উপর বিশেষ প্রসন্ন নয় বলে মনে হল।

তিতির খাবার নিয়ে এসে বলল, "এইভাবে একটা মানুষ এই ঠাণ্ডায় বাইরে পড়ে থাকতে পারে? তাছাড়া, সিংহ বা চিতা খেয়ে নেবে যে।"

"পাহারায় তো থাকবই কেউ না কেউ। তাছাড়া আমি কী করব! ঋজুদার অর্ডার!"

তিতির জল দিয়ে ওর নাক মুছে দিল। তারপর খেতে দিল। গাণ্ডেপিণ্ডে খেলেন মিস্টার ডবসন। ধন্যবাদ দিলেন আমাদের। তারপর হাঁউমাউ করে মেয়েদের মতো কাঁদতে লাগলেন।

তিতির বলল, "ঋজুকাকা নিশ্চয়ই ভুল করছে। এ লোকটা খারাপ হতেই পারে না।"

আমারও তাইই মনে হচ্ছে। কিন্তু ঋজুদাকে কে বলবে যে, সে ভুল করছে? এদেশে মানুষ বড় হয়ে গেলে, তার নামডাক হয়ে গেলে গর্বে বেঁকে গিয়ে তারা ভাবে যে, দে আর ওলওয়েজ রাইট, ইভন্ হোয়েন দে আর রং।

ঋজুদা কিছুক্ষণ পর নেমে এল। ডামু বোধহয় জমিয়ে খাচ্ছে। ওর গল্প শুনতে হবে। কী কী হল পথে? কেমন করে ও এল? এই ডবসনকেও বা জোটাল কেমন করে?

তিতির বলল, "ঋজুকাকা, তুমি বোধহয় লোকটার প্রতি অন্যায় করছ!"

ঋজুদা বলল, "হয়তো করছি।" আমার দিকে ফিরে বলল, "রুদ্রবাবুরও কি তাই-ই মত?"

আমি চুপ করে রইলাম।

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে বলল, "বুঝেছি। লোকটা যে সায়েব! সাহেবি পোশাক পরনে। অক্সোনিয়ান অ্যাকসেণ্টে ইংরেজি বলে, সুতরাং সে কি আর চোর হতে পারে, না মিথ্যেবাদী? এই সায়েব-ভীতি এবং প্রীতিতেই বাঙালি জাতটা গেল। যে-কেউ যদি চোস্ত ইংরেজি বলে বা কারো পিঠ চাপড়ায় অমনি তোরা তাকে পুজো করতে লেগে যাবি। আমি যা বলছি তাই-ই হবে। আমার কথার উপর কথা নয় কোনো। ডবসন এই বাইরেই পড়ে থাকবে।"

তিতির বলল, "সিংহে হায়নায় খেয়ে নেবে যে!"

"নিলে নেবে।"

"এ কী রে বাবা!" তিতির স্বগতোক্তি করল।

ঋজুদা উত্তর না দিয়ে ডবসনকে সায়েবদেরই মতো ইংরেজিতে বলল, "আপনার কাগজপত্র আমি দেখলাম। আপনার জীবনের ভয় নেই কোনো। খেতে-টেতেও পাবেন। সকালে আধ ঘণ্টার জন্য আপনার দড়ি খুলে দেওয়া হবে। বিকেলেও তাই। পালাবার চেষ্টা করবেন না। পালাবার চেষ্টা করলেই মেরুদণ্ডে গুলি খাবেন।"

"মিস্টার বোস! আপনি আমাকে চিনতে পারলেন না! আপনার বন্ধু মিঃ ম্যাকআইভরের আমি এত বন্ধু! আপনি এমন একজন চমৎকার লোক!"

ঋজুদা বলল, "আমি জানি যে, আমি চমৎকার লোক। আপনার সার্টিফিকেটের দরকার নেই আমার।" তারপর বলল, "আমি ছেড়ে দিলে ফিরে গিয়ে ফিল্মের সিনারিও লিখবেন। খুব নাটকীয়ভাবে কথা বলতে পারেন আপনি। জীবনে এ-সবের কোনোই দাম নেই।" (ক্রমশ)

ছবি : অনুপ রায়

সমাস-সমস্যা

সাধনা মুখোপাধ্যায়

ব্যাকরণে কী ভয় !
তোমরা বুঝি নি-ভয় ?
হাসছ কেন হি-হি,
সমাস বহুব্রীহি
ভেবেছিলাম সোজা
দেখছি গভীর ডিহি !
কর্মধারয় সমাস
বুকের মধ্যে দমাস্ ।
মধ্যপদলোপী
শক্ত বাঁধাকপি—
মোড়কের পর মোড়ক
কোথায় যে তার কোরক !
লাগছে কিসে ধন্দ ?
ওই যে সমাস দ্বন্দ্ব,
তার মধ্যেও বিভাগ
নানান খানাখন্দ !
শক্ত যেন বুরুশ
সমাসটি তৎপুরুষ
মধ্যমণি ষষ্ঠী
উঁচিয়ে আছেন যষ্টি
আর রয়েছে যারা
বাদ যাবে কি তারা ?
অব্যয়ীভাব দ্বিগু
ভয়েই বাক্যহারা !

ছবি: দেবাশিস দেব

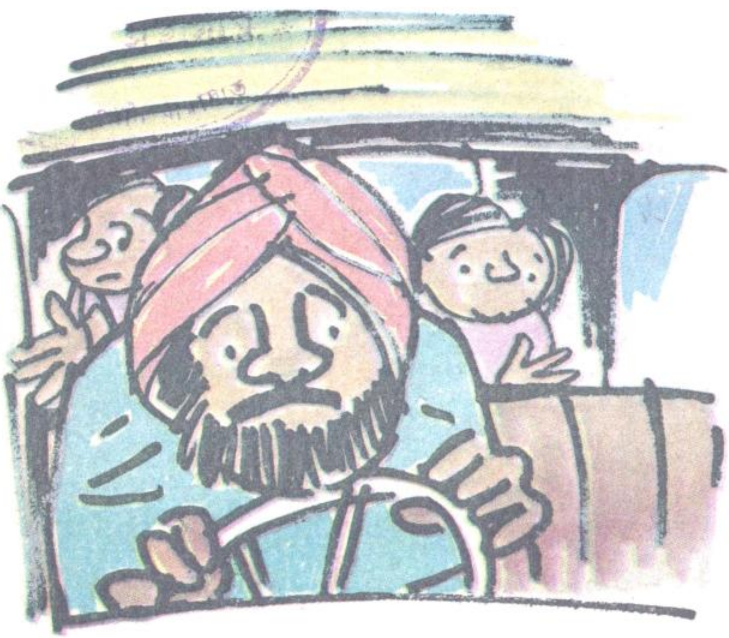

সম্পূর্ণ উপন্যাস

লঙ্কা মরিচ ও এক মহামানব

আশাপূর্ণা দেবী

ব্যাস ! হয়ে গেল ।

নো হোপ ! আর কোনো আশা নেই ।

ভবিষ্যতে আর কখনো মামার সামনে দাঁড়িয়ে সাবালকত্বের দাবি নিয়ে লড়াই করার মুখ থাকল না লঙ্কার ।

উঃ ! একেই বলে কপাল ! মানে দুষ্কপাল ! মনের মধ্যে যখন সেকেণ্ডে একশো কুড়ি কিলো মিটার বেগে ঝড় বইছে, ঘড়ি দেখতে দেখতে ঘড়ি আর চোখ দুইই ক্ষয়ে যেতে বসেছে, দেখতে দেখতে, 'ওরে বাবা রে, এ কী হল রে' বলে পরিত্রাহি চেঁচাতে ইচ্ছে হচ্ছে, সর্দারজির পাগড়িটার ওপর ধাঁই ধপাধপ বাদ্যি বাজিয়ে ট্যাক্সির চালটা ফুঁড়ে বেরিয়ে পড়ে রকেটের গতিতে গিয়ে হাওড়া স্টেশনের আট নম্বর প্লাটফর্মে আছড়ে পড়তে ইচ্ছে হচ্ছে, তখন কিনা এতক্ষণ ধরে ল্যাংচানো গাড়িখানা সেই

ল্যাংচানিটুকুও থামিয়ে ফেলে ঝাড়া জবাব দিয়ে বসল।

'টেক্সি যাবে না!'

'যাবে না!'

লঙ্কা আর মরিচ দু'দুজনে একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠল। 'ট্যাক্সি যাবে না? কাহে?'

'টায়ার পাংচার!'

'উরে বাবা রে! উরে বাবা রে! ও সর্দারজি, হামরা যে এতক্ষণ ধরে বোলে চলতা হ্যায় গাড়ি এতনা আস্তে যাতে হ্যায় কাহে? আপ বোলেগা যে ঠিক আছে।'

কথাটা সত্যি সেই কখন থেকে, বোধ হয় রবীন্দ্রসদনের কাছাকাছি সেই ঘণ্টাখানেকব্যাপী জ্যামটা ভাঙার পরই ট্যাক্সিটা কেমন যেন ঘসটাতে শুরু করেছে।

এদিকে ঘড়ির কাঁটা দৌড় মারছে।

কাজেই লঙ্কা মরিচ দুজনেই আকুল ব্যাকুল হয়ে কাতরে চলেছে, ও সর্দারজি, জোরসে চলাও না দাদা! ট্রেন যে মিস করেগা। ও সর্দারজি, গাড়ি কি গড়বড় হোগা? এতনা আস্তে চলতা কেন?

তখন কিন্তু সর্দারজি পাকা গোঁফের ফাঁকে মুচকে মুচকে হেসে বলেছে, বকবক থামাও তো বাবারা। চলো না।

তার মানে ও দিব্যি বাংলা জানে। বেচারা ছেলে দুটো বৃথাই এতক্ষণ বিশুদ্ধ বিশুদ্ধ হিন্দি শব্দ খুঁজেপেতে কথা চালিয়ে মরছিল!

কিন্তু এখন?

এখন যেই গাড়িটা থেমে পড়ল, লোকটা কিনা অবলীলায় বলে উঠল, 'টেক্সি যাবে না।'

আর লঙ্কা মরিচ যখন বাবা রে মা রে করে চেঁচিয়ে উঠে প্রশ্ন করল, এতক্ষণ ধরে কেন তবে ও 'ঠিক আছে' বলছিল ! কেন ? কেন ? তখন তিনি ওনাদের মানে সর্দারজিদের সেই পেটেন্ট ভাঙা ভাঙা খ্যাঁকখেঁকে বাজখাঁই গলায় বলে উঠলেন, 'ওঃ ! খালি বকর বকর, বকর বকর। টায়ারে পিরেক উরেক সেঁদিয়ে গেল, তো সর্দারজি কী কোরবে ? যাও যাও উতার যাও বাবারা, আনা টেক্সি দেখে লাও, সর্দারজিকে ছোড় দাও।'

অর্থাৎ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে কেটে পড়।

যেন এই ছেলে দুটো নেহাত খোকামাত্র, দাবড়ানি দিয়ে নামিয়ে দিলেই হল। আপনিটুকু পর্যন্ত বলছে না। আর বেচারি লঙ্কা মরিচ ? এতক্ষণ সমানে ওকে 'আপ আপ' করে আপ করে চলেছে। ...উঃ ! লোকটাকে কেটে কেটে নুন দিলেও রাগ যাবে না।

আসলে হয়তো লোকটা ভেবেছিল, ওই হাওয়া বেরিয়ে যাওয়া হাওয়াগাড়িখানা নিয়েই নেংচে ঘসটে যা হোক করে ছেলে দুটোকে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে দিতে পারবে, কিন্তু হল না ! শেষরক্ষা হল না। অত অবজ্ঞা দেখালে কখনো হয় ? 'দর্পহারী' নামের সেই যে কে একজন আছেন না ? সর্বদা গদা হাতে এক পায়ে খাড়া, তিনি ছাড়বেন ? একটি ঢিলে দুই পাখি মারলেন তিনি। অর্থাৎ গদার একটি ঘায়ে দু'পক্ষেরই দর্পপূর্ণ করে ছাড়লেন।

এক 'দমাস'-এই সর্দারজির গাড়ির টায়ার আর, লঙ্কা মরিচের প্রেস্টিজ্ দুই পাংচার।...

এখন ট্রেন ফেল করে পরাজিত সৈনিকের মতো বাড়ি ফিরে যেতে হলে অবস্থাটা কী হবে ? মরিচের কী হবে না হবে কে জানে, কিন্তু লঙ্কার ? লঙ্কাকে কি মামা পইপই করে বলেনি,'অফিসভাঙা টাইম বড় সাংঘাতিক রে লঙ্কা, তার আগেই বেরিয়ে পড়। তিনটের মধ্যে বেরোতে পারলেই খোলা রাস্তায় নিশ্চিন্তে পৌঁছে যেতে পারবি।'

'মামা !' হো-হো করে হেসে উঠেছিল লঙ্কা, তার সঙ্গে মরিচও (যদিও মরিচ ঠিক তার ভাগে নয়)—'ও হো হো ! রাত নটায় গাড়ি, আর তিনটের মধ্যে—হি হি এটা বড্ড বেশি গাঁইয়ামি হয়ে যাবে না মামা ? তিনটের সময়! খিঃ খিঃ !'

মামা অবশ্য এ হাসিতে বিচলিত হননি। মামার আজীবনের নিয়ম রেলগাড়িতে চাপতে গেলেই ন্যায্য মার্জিনের ওপর আরো দু'ঘণ্টা বাড়তি মার্জিন হাতে রাখা ! রাস্তায় কখন কী হয় বলা যায় ? ...রাস্তার মোড়ে মোড়ে গাঁটে গাঁটে জ্যাম, মানে যানজট সেটা তো নিশ্চিত ঘটনা, সি এম ডি এ-র খোঁড়াখুঁড়ির ফলে ক্রমেই বেড়ে চলেছে।...সন্ধে হওয়া মাত্রই লোডশেডিং, সেটাও তো অবধারিত।...তা ছাড়াও বাস ট্রাম ট্যাক্সি, সবই তো কলকব্জার ব্যাপার। হঠাৎ বিগড়ে বসলেই হল—গাড়ি গড়বড় ! আর যাবে না। ...তাও যদি না হয় তুমি হঠাৎ একটা বিরাট মিছিলের পিছনে পড়ে গেলে। ডাইনে বাঁয়ে কোনোদিকে নাক গলাবার ফাঁক নেই। থাকো বসে নট নড়নচড়ন নট কিছু হয়ে।

'বাঃ, হঠাৎ মিছিল হতে যাবে কেন ?'

'হতে যাবে কেন ? তুই যে হাসালি লঙ্কা ! মিছিলের আবার কেন কী ? মিছিলের কোনো মা-বাপ আছে ? হলেই হল। মৌনমিছিল, মুঠোপাকানো মিছিল, শোকমিছিল, সুখমিছিল, কিছু না হোক কোনো বড়লোকের বিয়েপার্টির মিছিল, রাস্তা অকুপাই করবার স্বাধীনতা সক্কলেরই আছে।...তবে ! নিজে সাবধান হওয়াই তো বুদ্ধির কাজ।...রেলগাড়ি তো তোমার এইসব সুবিধে অসুবিধের ধার ধারবে না

বাপু ? ঘণ্টিটি বাজবে কি ফস করে ফসকে বেরিয়ে যাবে। তখন ? তখন তুমি প্লাটফর্মে গড়াগড়ি খেলেও ফিরে তাকাবে ?...ওই জিনিসটি হচ্ছে যমরাজার মতো অমোঘ কঠিন। নিজে দেরি করছে ? করুক। কিন্তু তোমার ব্যাপারে কড়া নিয়মী। তোমার পরমাত্মীয় মর-মর ? তার তো বয়েই গেল। তোমার চাকরিতে ইন্টারভ্যু ? তার কাঁচকলা। এক মিনিটের লেটে তোমার প্রাণের বন্ধুর বিয়েতে যেতে পেলে না ? তার তাতে কচুপোড়া, দিব্যি তোমায় বক দেখিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বেরিয়ে যাবে।...এর ওপর আবার রেলবাবুদের মর্জি আছে।...তুমি হয়তো জানো তোমার গাড়ি ন'নম্বর প্লাটফরম থেকে ছাড়বে, ফট্ করে লাস্ট মোমেণ্টে অ্যানাউনস্ শুনতে পাবে—না না ওটা ছ'নম্বর থেকে ছাড়ছে। তার মানে প্যাসেঞ্জার বেচারাদের মালমোট নিয়ে একদম নয়ছয় কাণ্ড।...তার চাইতে ঘণ্টাকতক আগে থেকে স্টেশনে বসে থাকলে ক্ষতিটা কী ?...জায়গাটা এমন কিছু খারাপও নয় !... কত রকম দৃশ্য-বৈচিত্র্য ! কত এক্সপিরিয়েন্স হয়।'

হ্যাঁ, এত রকম যুক্তি দেখিয়েছিল মামা, ট্রেন ছাড়ার টাইমের ছ'ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়বার জন্যে।...লঙ্কারা কি শুনেছিল সে কথা ? হো-হো করে হেসে উড়িয়ে দেয়নি ?...

বিশেষ করে মরিচ ? আড়ালে হেসে হেসে বলেনি, 'তোর মামার মাথায় একটু ছিট-টিট্ নেই তো ?... রাত নটায় গাড়ি, বেলা তিনটেয়—হি হি।'

শুনে লঙ্কা আরো বিদ্রোহী হয়ে উঠে বেলা পৌনে তিনটের সময় বলে উঠেছিল, 'মামা, পুরো সামার ভেকেশানটা যখন বেনারসেই থাকতে হচ্ছে—আমি এখান থেকে চুলটা একটু ছেঁটে নিই।'

শুনে তো মামা অ্যাঁ করে বসে পড়েছিল। 'এখন তুই চুল ছেঁটে নিতে যাচ্ছিস ? সেলুনের লাইন জানিস ?'

এই প্রথম সাবালকত্ব পাওয়ার অহঙ্কারে লঙ্কা ভারিক্কি চালে বলেছিল, 'এখন ফাঁকা ! তাছাড়া ছটার আগে তো আর বেরোচ্ছি না।'

'ছটা ? বলিস কী লঙ্কা ? মাত্র তিনঘণ্টা সময় হাতে নিয়ে ?'

'তিনঘণ্টাই এন্আফ্ মামা ! যেতে বড়জোর একঘণ্টা, না হয় দেড়ঘণ্টাই, তাহলেও হাতে রইল দেড় !'

॥ ২ ॥

সেই 'হাতে রইল দেড়টি' নিয়েই বেরিয়েছিল লঙ্কা আর মরিচ।...গেটের সামনে কাঁদো-কাঁদো মুখে দাঁড়িয়ে থাকা মামাকে টা-টা করে সাঁ করে বেরিয়ে পড়েছিল লঙ্কা। আর লঙ্কার থেকে চারদিনের ছোট তার পিসতুতো ভাই মরিচ।

এই ট্যাক্সি সেই ট্যাক্সি। তখন স্টার্ট দিয়েছে কি সাঁ ! যেন ইলেকট্রিক ট্রেনের সুইচ টেপা হল।...আর এখন ?

এখন আর কী ? টায়ারে 'পিরেক-উরেক' ফুটে গেলে, সর্দারজি কী করবে ?

'পেরেক ফুটেছে আমাদের কপালে রে মরিচ। নইলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পর্যন্তই—গাঁটে-গাঁটে জ্যাম ?...বাঘাযতীনে জ্যাম, গড়িয়াহাটে জ্যাম, দেশপ্রিয়য় জ্যাম, রবীন্দ্র সদনে জ্যাম—তারপরই তো এই ! গাড়ির ঘসটানি !'

মরিচ বলল, 'মামার শাপ ফলল আর কী !'

'এই খবরদার ! মামার শাপ মানে ? মামা সেই রকম লোক ? বল যে গুরুজনের কথা না শোনার ফল !'

'আরে বাবা, তাই তাই। কিন্তু এখন ?'

'মরিচ, তোর ঘড়িতে এখন কটা ?'

'এই নিয়ে দুশো আশিবার জিজ্ঞেস করেছিস। তোর ঘড়িতে যটা, ঠিক তটা।'

'সর্দারজি, আপকো ঘড়িমে—'

'আঃ ! বাবারা ! কেনো ছুপছাপ করছ ! চটপট নেমে পড়ে আর একটা টেক্সি ধরে ছুটছুট চলে যাও না !'

'আর একটা ট্যাক্সি ?'

যেন হাওড়া ব্রিজের পায়ের কাছে, এই রাত পৌনে নটার সময় খালি ট্যাক্সি কিলবিল করছে।

কিন্তু সে কথা বলে লাভ কী ? সর্দারজি তো ওদের মালপত্তর রাস্তায় নামিয়েই দিয়েছে ততক্ষণে !

'এই, এই লঙ্কা, দেখেছিস কাণ্ড ! বড়পিসির জন্যে দেওয়া বিশুদ্ধ টিনের সুটকেসটাকে রাস্তায় নামাল। মা পইসই করে বলে দিয়েছিল, যেখানে-সেখানে নামাসনি, যা-তা হাত দিসনি। বাবা আজই নতুন কিনে এনেছে।'

লঙ্কার মলিন মুখ, কী আর করা যাবে !··· মামা তবু ব্রাউন পেপার ঢাকা দিয়ে মুড়েফুড়ে দিয়েছে ! গোলাপ-ছাপমার্কা টিনের সুটকেস দেখে তো হাঁ হয়ে গিয়েছিল মামা।···বলল, আমি তো গাঁইয়া, আর এটা কী ? হা হা হা, এটা কী ? গোলাপ-ছাপ ! এ জিনিস এখনো বাজারে পাওয়া যায় ?

কিন্তু এখন আর এটার রহস্য নিয়ে ভাবার সময় নেই। লঙ্কাদের গাড়ি ছাড়বার কথা জাস্ট রাত নটায়, এখন নটা বাজতে বারো মিনিট। ওরা নিজেদের পায়ের কাছে তিন-তিনটে সুটকেস, একটা টিফিন ক্যারিয়ার, একটা চায়ের আর একটা জলের ফ্লাস্ক আর একঝোলা বই নিয়ে হাওড়া ব্রিজের পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে, যদি কোনো খালি ট্যাক্সি জুটে যায় !

কিন্তু গেলেই কি এখনো চান্স আছে ? ট্রেনের নিয়ম তো যমরাজার নিয়ম।

'আর বোকার মতো দাঁড়িয়ে থেকে কোনো মানে আছে লঙ্কা ?' মরিচ বলল, 'চল এখন পাঁচ নম্বর বাসে চেপে ভগ্নদূতের মতো মুণ্ডু হেঁট করে তোমার গাঙ্গুলি বাগানে ফিরে চল।...আমি বাবা আগেই কাট্ মারব। তোমার মামার সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছি না! তার ওপর আবার তোর সেই মাসি ! না বাবা !'

লঙ্কা জ্বলন্ত গলায় বলল, 'আগে কাট্ মারবি মানে ? কোথায় নামবি ?'

'ঢাকুরের দিদি-জামাইবাবুর বাড়ি ! উপায় কী ? ট্রেন ফেল করে, তাঁর দিদির জন্যে বহু কষ্টে বানানো বিশুদ্ধ খাবার-টাবার সহ ফেরত এসেছি দেখলে মা বাড়িতে ঢুকতে দেবে ভেবেছিস ?'

'মরিচ, আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। তুই চলে যা, আমি ফিরছি না।'

'ন্যাকামি রাখ। মানুষ ট্রেন ফেল করে না ?'

'করে। কিন্তু আমার কেস আলাদা। ভেবে দেখ, মামার সঙ্গে লড়াই করে আর বড়াই করে—'

'হোই ! হোই !'

কথার মাঝখানে ভাঙা খ্যাঁকখেঁকে গলায় কোথা থেকে যেন একটা বাঘ গর্জে উঠল।

কী আশ্চর্য !

সেই সর্দারজি, রাস্তার ধারে একাই মল্লযুদ্ধ করে চাকায় নতুন টায়ার পরাচ্ছিল। এখন খেঁকিয়ে বলে উঠল, 'বুড়বাকের মতো দাঁড়িয়ে আছ যে বাবারা ? সামনে একটা টেক্সি খালি হল দেখছ না ?'

অ্যাঁ। সত্যি !

তাই তো ! হাত কয়েক দূরেই একটা ট্যাক্সি থেকে দুটো বিটকেল সাজকরা লোক নেমে পড়েই, প্রায় ছুট মারার মতোই দ্রুত পায়ে হাঁটতে শুরু করেছে, আর ট্যাক্সিখানার

চালক বোধহয় ওই ব্যাঘ্রগর্জন শুনেই দাঁড়িয়ে পড়েছে !

সর্দারজি ততক্ষণে নিজের কাজ ফেলে এগিয়েও এসেছে। ফটাফট ওদের জিনিসগুলো গাড়ির মধ্যে ঢুকিয়েও দিয়েছে।

'সর্দারজি ! এখন গিয়ে ট্রেন পাব ?'

'আরে বাবা ! যাও না। বিশ্ওনাথকা মর্জি হলে টিরেন ছাড়তে দেরি হোবে। হাঃ হাঃ হাঃ। টিশনমাস্টারবাবু জল খাবে, পান খাবে, সিগ্রিট্ খাবে, তব তো, আরে যাও যাও ভাগো ! তুরন্ত ! হাঃ হাঃ !'

উঃ ! একটু আগে ওই লোকটাকেই কেটে কেটে নুন দিতে ইচ্ছে করছিল, আর এখন ফুল দিয়ে পুজো করতে ইচ্ছে করছে।...

কিন্তু এমনি ভাগ্য ফুলচন্দন তো দূরের কথা, একটু টাটাও করা হল না।... গাড়ির দরজাটা বন্ধ করবার আগেই কিনা ঝপ্ করে লোডশেডিং !

নাঃ ! আজ আর কোনো সুরাহা নেই। কূলে এসে তরী ডোবা। এত কাণ্ডর পর কিনা গাড়িতে বসা মাত্রই লোডশেডিং !

মরিচ ফিসফিস করে বলল, 'লঙ্কা ! স্টেশনে যাবি, নাকি এই গাড়িতেই বাড়ি ফিরে যাবি ?'

'চুপ কর। পাগলের মতো কথা বলিস না। শেষ অবধি দেখব।'

এ ট্যাক্সির চালকটি আবার পিওর বাঙালি। ওইটুকুই তার কানে গেছে। বলে উঠল, 'কী দাদা, যাবেন কোথায় ?'

'কোথায় আবার, হাওড়া স্টেশনে।'

'ঠিক তো ? নাকি আগের ওই মহাপ্রভু দুটির মতন হঠাৎ মত পালটে নেমে পড়বেন ? যাচ্ছিল ট্রেন ধরবে বলে, হঠাৎ ফট্ করে বলে উঠল এখানে নেমে যাব। যেমন সঙের মতন সাজ ! তেমনি—'

হঠাৎ চুপ করে গেল। বোধহয় ভাবল এভাবে বলাটা উচিত নয়।

তবে সাজটা যে সঙের মতো, সেটা লঙ্কারা লোডশেডিং হবার আগেই এক নজরেই দেখতে পেয়েছে।

একজনের পরনে লাল টকটকে চেককাটা লুঙ্গি, আর গায়ে গাঢ় নীল লম্বাঝুল পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির আবার বুকে ফুলকাটা কাজ। দুদিকে ঝুলে পড়া একজোড়া গোঁফ, মাথার মাঝখানে সিঁথি। অন্যজনের পরনে কটকটে সবুজরঙা সেই আদ্যিকালের চোঙা পেন্টুল, গায়ে আরো কটকটে হলদে শার্ট, ডান হাতে দুলদুলে ঘড়ি, এই রাত্রিকালেও চোখে গগলস। গলায় আবার একখানা ফুলছাপ রুমাল বাঁধা।

চকিতের মধ্যেই দেখা হয়ে গেছে। শুধু পায়ের দিকটা চোখে পড়েনি। কাজেই জুতোর জাতটা ধরা যায়নি। তা না যাক, জুতো নির্ঘাত নাগরা। ছাপরা জেলার অথবা আরা জেলার কোনো দেহাতি গ্রামের যাত্রী তাতে সন্দেহ নাস্তি।

কিন্তু নেমে গেল কেন ?

নিশ্চয় কিছু দরকারি জিনিস ফেলে এসেছিল।

জরু নয় তো ?

মরিচটা পাকার ধাড়ি, হি-হি করে হেসে বলে, 'জরুরা হয়তো এখনো বাড়ি বসে "টেরেনে" খাবার জন্যে রোটি পাকাচ্ছে, আর এরা ভুলে ভুলে গাড়িতে উঠে পড়ে—হি হি হি। হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায়—খিক খিক খিক !'

ট্যাক্সি স্টেশনে এসে পৌঁছে গেল।

॥ ৩ ॥

স্টেশন আলো ঝলমলে।

আর ? আর অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বাবা বিশ্বনাথের গাড়ি ফস করে ফসকে বেরিয়ে যায়নি। বসে আছে এখনো।

কারণ ? কারণ যান্ত্রিক গোলযোগ। যাত্রাপর্বেই আধ ঘণ্টা লেট।...আরো আশ্চর্যি, ছাড়বে ঠিক নম্বর থেকেই, আর রিজার্ভেশন স্লিপগুলোও ঠিক জায়গায় ঠিকমতো সাঁটা। ...অতএব ঝপাঝপ উঠে পড়ে গদি-আঁটা সিটে বসে পড়া। এতসব অবিশ্বাস্য ঘটনার পর কোন্ অবিশ্বাসী বলবে, 'ভগবান বলে কিছু নেই।' মরিচ তো তাই বলে। অন্তত এতক্ষণ তাইই বলে চলেছিল।

এখন লঙ্কা, চেঁচিয়ে উঠল, 'মরিচ রে। ভগবান আছেন কি না ?'

মরিচ কামরায় ঝোলানো সামনের আরশিটায় মুখ দেখতে দেখতে বলল, 'থাকবেন না তো যাবেন কোথায় ? চিরঅমর হয়ে বসে আছেন না ? পালাবার পথ আছে ?'

'মরিচ ! কী দারুণ। আমাদের দুটো বার্থই আপার। উঠে পড়ে দিব্যি পা ঝুলিয়ে বসে পা দোলাব।'

'তা আর নয়, নীচে যারা থাকবে তারা নাকের ওপর পা দোলানো সহ্য করবে ! ওদের নাম দুটো মনে আছে ? দেখলি তো রিজার্ভেশন লিস্টে !'

'একটা যেন মনে হচ্ছে ইয়াসিন, আর একটা মনে পড়ছে না।'

'ইয়াসিন !! সেরেছে !'

যারা এখনো আসেনি তাদের সিটে বসেছিল মরিচ, তড়াক করে লাফিয়ে উঠল, 'বড়মাসির টিনের সুটকেসটা ? তোল তোল, ওপরে তুলে ফেল। আমি বরং বালিশের বদলে ওইটা মাথায় দিয়েই শোব।'

তাই তো, সর্বনাশ ! সেটা নীচে নামানো রয়েছে। ওই ইয়াসিনরা এসে জুতোই ঠেকিয়ে বসবে, না গোস্তরুটি ঠেকিয়ে বসবে, কে জানে।

লঙ্কা তাড়াতাড়ি সেটা তুলতে গিয়ে বলল, 'বেশ তো কাগজ-ফাগজ মুড়ে সভ্যভব্য করা ছিল, সেটা আবার খুললি কেন ?'

'আমি খুলতে যাব কী জন্যে ? ওই সর্দারজির টানাহেঁচড়াতে বোধহয়—এ কী রে, গাড়ি যে নড়ে উঠল, এরা এল না তো ?'

'না এল তো তোর দুঃখু কিসের ?'

'বাঃ ! বার্থ দুটো খালি পড়ে থাকবে ? আরে আরে যাঃ ! সত্যিই ছেড়ে দিল যে রে—যাচ্চলে !'

মরিচ দরজাটা লক্ করে দিয়ে এক পাক নেচে নিয়ে বলে উঠল, 'কী মজা ! কী মজা ! পুরো কামরাটায় শুধু আমরা। নীচের দুটোয় শোব, ওপরে জিনিসপত্র তুলে দেব। কী দারুণ ! কী নিদারুণ। লঙ্কা ! তোর নাচতে ইচ্ছে করছে না ধেই ধেই করে ? গান গাইতে ইচ্ছে করছে না হেঁড়ে গলা ছেড়ে ?'

'করছে ! সবই করছে ! কিন্তু একটু ভয়-ভয়ও করছে !'

'ভয় ! মানে ? বন্ধ কামরায় হঠাৎ অশরীরী আত্মার আবির্ভাব-টাবির্ভাব ? না কি—'

'ভাগ ! বোকার মতো কথা বলছিস কেন ? শরীরীদের কথাই হচ্ছে। ওরা এল না, আর আমরা ওদের জায়গাগুলো দখল করে—'

'করে তো কী ? আমরা ওদের গাড়ি থেকে ফেলে দিয়েছি ? বুদ্ধুরা হাঁদার মতো ট্রেন ফেল করল সেটা আমাদের দোষ ?'

তাই তো ! সেটা কি আমাদের দোষ ? ওরা যদি ভ্যাবাগঙ্গারাম হয়, অ্যাঁ ? লঙ্কা জোরালো গলায় বলল, 'একেবারে হাঁদা নম্বর ওয়ান। ট্রেন আধ ঘণ্টা পরে ছাড়ল, তবু মিস করল ! ছ্যা, ছ্যা !'

'যা বলেছিস ! ছ্যা ছ্যা !'

'মরিচ ! আমি তা হলে বিনা গার্জেনে

একা ট্রেন জার্নি করছি ! ভাবা যায় ?'

'আমি তো রয়েছি।'

'তুই আমার গার্জেন ? চার দিনের ছোট না ?'

'ও, তাও তো বটে !'

'এখন আমরা পুরো স্বাধীন, কী বলিস ?'

'পুরো !'

'এর পর আর বড়পিসি নাবালক বলে ধিক্কার দিতে পারবে ?'

'দিক না দেখি।'

শুনে লঙ্কার আহ্লাদে চোখে জল এসে যায়। উঃ! বড়পিসির সেদিনের সেই চিঠিটা ? এক একটা লাইন যেন এক একটা জ্বলন্ত দেশলাইকাঠির ছ্যাঁকা ! তার ওপর আবার ডঙ্কার পর্বতারোহণের খবর !

সাধে কি আর সেদিন লঙ্কা মামার সঙ্গে ওরকম মারকাটারি লড়াই করে সাবালকত্ব আদায় করে নিয়েছিল ? খুব কড়া কড়া কথাই বলা হয়ে গেছে বোধহয়।

মরিচ বলল, 'এই লঙ্কা, খেয়ে নিলে হত না ? পেটের মধ্যে তো দিব্যি ইঞ্জিন চলতে শুরু করেছে।'

'রোস ! একটু জিরোতে দে। উঃ যা ঝড় গেল। এখনো প্যাল্‌পিটেশান থামেনি।'

লঙ্কা ইয়াসিন না গিয়াসুদ্দিন কার যেন বার্থতায় লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে চোখ বোজে ! একে একে ভাবতে শুরু করে, গোড়া থেকে কী কী হয়েছিল।...আদ্যোপান্ত ! ঘটনাগুলো সিনেমার ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠছে।...লঙ্কা যেন টিভি দেখছে।

॥ ৪ ॥

'মামা !'

লঙ্কার হাতে একখানা খোলা চিঠি। লঙ্কা মামার কাছে এসে আছড়ে পড়ল, 'মামা ! এই দ্যাখো ! এর পরও তুমি আমায় বাঙালি করে রাখতে চাইবে ?'

চিঠিখানা মামার সামনে ফেলে দিল লঙ্কা।

মামা সেদিকে তাকিয়ে দেখল না।

ভাগ্নের মুখের দিকেই হাঁ করে তাকিয়ে বলল, 'কী বললি, আর একবার বল তো শুনি ?'

'আর একবার বলতে যাব কী জন্যে ? তুমি আমায় চিরকাল বাঙালি করে রেখে দিচ্ছ না ?'

'আমি ! কী সর্বনাশ ! আমি কী করলাম ? বাঙালির ঘরেই তো জন্মে বসে আছিস বাপ ! তাহলে ? নেপালি হবি, না ভূপালি হবি, না কি অকালি হবি ?'

'আঃ দাদা ! ওর পিসির চিঠিটা পড়েই দ্যাখো না—' বলতে বলতে মাসি চলে এসেছে এ ঘরে। চোখা মুখ, চোখা চেহারা, খাটো চুল, সাদা থান, ন্যাড়া হাত, তেজপাতার ওজন। দু হাতে দুটো বোনার কাঁটা, গলায় ঝোলানো উলের গোলা।

মাসি আছে আর বোনার কাঁটা নেই পশম নেই, এ দৃশ্য ভাবা যায় না।

ঘরে ঢুকে কথাটা শেষ করল মাসি, 'পড় না দাদা, তোমার ভাগ্নের পিসির চিঠি ! আমরা মামাতে আর মাসিতে মিলে ওনার ভাইপোটিকে নাকি মানুষ হয়ে উঠতে দিচ্ছি না, স্রেফ বাঙালি করে রেখে দিয়েছি।'

'ও হো হো হো !' মামার ছাদ ফাটানো হাসি, 'সেই সাত কোটি সন্তানেরে–হো হো হো ! লঙ্কার সেই জাঁদরেল পিসি ? দেখি কী লিখেছেন ! এই সেরেছে ! পড়ার চশমাটা তো সেই তিনতলায় ! রাত্তিরে পড়তে পড়তে বালিশের তলায়—লঙ্কা, তুইই পড় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।'

লঙ্কার হাঁড়ি-হাঁড়ি মুখ। আঃ, কেন যে চশমাটা ! 'ওসব চেঁচিয়ে ফেঁচিয়ে পড়তে পারব না। এনে দিচ্ছি চশমা।'

'থাক, আমিই পড়ে দিচ্ছি—'

মাসি ফস করে চিঠিটা উঠিয়ে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে শুরু করে দেয়।

'পরম কল্যাণীয়। ওরে বাপ লঙ্কা ! কতদিন যে দেখিনি তোকে !...বলি কবে কতদিনে নাবালকত্ব ঘুচবে তোর ?...কবে সাবালক হবি ?...কলকাতা থেকে কাশী গাড়ি বদলের বালাই নেই, গায়ে এক গা গহনাও নেই যে ছিনতাইয়ের ভয়। এইটুকু

আর একা চলে আসতে পারিস না ? কবে কার সুবিধে হবে তবে তার সঙ্গে আসবি। উঃ। মায়ামাসি দেখছি তোকে একদম খোকামার্কা করে মানুষ করছে। এখন তুই ক্লাস নাইনের ছাত্র না ? ছি ছি !...সামনেই তো লম্বা গরমের ছুটি, চলে আয় না সাহস দেখিয়ে ! বুড়ি পিসি চুলোয় যাক, একটা ভাইও তো আছে তোর এখানে ? সে তো কবে থেকে লায়েক হয়ে গিয়ে আমায় নিয়ে তীর্থ-টির্থ করিয়ে আনছে। এই সেদিন হরিদ্বার লছমনঝোলা হৃষীকেশ—'

মামা বলে উঠল, 'কে কাকে নিয়ে ? লঙ্কার সেই দেবী চৌধুরানী পিসিটা তো ? তাঁকে আবার—'

'আঃ দাদা ! দেবী চৌধুরানী আবার কী ? দেবলারানী চৌধুরী !'

'ওই হল ! একই কথা।'

মাসি বলল, 'সবটা শোনো তো ! পরে রিমার্ক কোরো।...

'ডঙ্কা শুধু আমায় নিয়ে বেড়িয়েই আনছে না, আবার পাহাড়চুড়োয় ওঠার শিক্ষণ শিবির নাকি তার মেম্বার হতে চাইছে।...বেটাছেলে একটু ডাকাবুকো হবে না ?...তাছাড়া—দ্যাখ বাবা, তোর ঠাকুর্দার হাতের পোঁতা আসল বেনারসি ল্যাংড়া আমের গাছগুলোর যত আম কেবল মুখপোড়া হনুমানদের আর পাড়ার গেছো বাঁদরদের পেটেই চলে যায়, একা ডঙ্কা আর আমি কত খাব ? তবু তুই এলেও—'

'এই রে, আমার তরকারি পুড়ে গেল।'

বলে পশম বুনতে বুনতে ছুটে বেরিয়ে গেল মাসি, চেঁচিয়ে বলে গেল। 'দাও দাদা। এবার লঙ্কাকে একাই চলে যেতে দাও, ওই গেছো বাঁদরদের দলবৃদ্ধি করতে।'

মামা বলল, 'ঠিক আছে। আমার অফিসের একটা পিয়নের বেনারসের কাছাকাছি কোথায় যেন দেশ ! ছুটি ছুটি করে মরছে। তাকেই বরং ছুটি স্যাংশান করিয়ে দিয়ে—তোর সঙ্গে—'

'নেভার ! কক্ষনো না ! আমি একলা যাব।' লঙ্কা অনমনীয়।

'সর্বনাশ ! হঠাৎ একেবারে বীর হনুমান! ঠিক আছে ! গুছিয়ে-গাছিয়ে গাড়িতে তুলিয়ে দিয়ে আসব !'

'কক্ষনো না ! তুলে দিতে যেতে পাবে না।...ডঙ্কা পাহাড়চুড়োয় উঠবে আর আমি—'

'আরে বাবা ! উঠলটা কখন ? সবে তো শিক্ষণ শিবিরে ভর্তি হবে ভাবছে—'

'ও একই ! তুমি টাকা-ফাকা যা দেবার দিয়ে দাও, টিকিট কেটে আনি। সামনের সপ্তাহেই তো আমার ভেকেশান শুরু।'

'টিকিটও তুই কেটে আনবি ? জানিস কত ধানে কত চাল ?'

'জানতে আর দিলে কবে ? বুদ্ধু করে রেখে দিয়েছ। এবার জানব !'

লঙ্কা এখন ভাবছে, ছি ছি ! ওভাবে কথাটা বলা ঠিক হয়নি। বেচারি মামা ! লঙ্কাকে ভালবাসে বলেই না—

তবুও মামা মান খুইয়ে যখন বলে, 'গোঁয়ার্তুমি করিস না বাবা, টিকিট-ফিকিটের ঝামেলাটা আমায় করতে দে !' তখন মামার মুখটা দেখে দয়া হয়েছিল লঙ্কার। তাই বলেছিল, 'আচ্ছা, ঠিক আছে। কিন্তু তুলে-টুলে দিতে যাওয়া চলবে না বলে দিচ্ছি।'

'একা বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবি ?'

'যাব তো কী ? তুমি যখন ট্যুরে যাও একা যাও না ?'

'আমি আর তুই ? মালপত্তর নিয়ে—' মামা হতাশায় ভেঙেই পড়ে প্রায়।

কিন্তু লঙ্কা মায়ায় গলবে না।

'মালপত্তর আবার কী ? শুধু তো একটা সুটকেস !'

'আহা, একটা টিফিন ক্যারিয়ারও তো থাকবে ! একটা জলের ফ্লাস্ক ! কিছু না হোক একটা চাদর বালিশ—'

এই সময় মাসি আবার এল দু কাঁটা হাতে, 'চিঠির শেষটা পড়েছ দাদা ?'

'আমি আবার কখন পড়লাম ? আমার তো ইয়ে চশমা !...তুই তো তরকারি পুড়ছে বলে—'

'লঙ্কা ! তুই পড়িসনি ?'

লঙ্কা থতমত খেল।

শেষটা ? কই ? প্রথমটা পড়েই তো মাথার রক্ত গরম হয়ে গিয়েছিল।

লঙ্কা অতএব রাগ দেখাল, 'শেষটায় আবার পড়ার কী থাকে ? সেই তো আশীর্বাদ-ফাশির্বাদ। বাড়ির সকলে কে কেমন—'

'না হে চাঁদু, তা নয় !'

মাসি আবার চিঠিটা উঠিয়ে নেয়। বলে, 'এই দ্যাখ্।...যদি পারিস রমলাকে, মানে তোর ছোটপিসিকে বলেকয়ে মরিচটাকেও সঙ্গে নিয়ে আয় না ! বেশ জমজমাটি গুলজার হবে।'

'অ্যাঁ, তাই নাকি ?'

মামা লাফিয়ে ওঠে। চেঁচিয়ে বলে, 'এতক্ষণ বলতে হয় একথা ? তবু তো তাহলে দুজনে যাবি !...যাই আমি দুটো টিকিট করে আসি।'

মরিচ ! মরিচকে নিয়ে যাবার কথা বলেছে পিসি ? এ ব্যবস্থাটা লঙ্কার অমনঃপূত হয়নি ! মরিচ তার থেকে ছোট, কাজেই কোনোমতেই গার্জেনের পোস্ট পাচ্ছে না।...পিসি তো বলেওছে,'তুই ওকে নিয়ে আয় !' এতে লঙ্কার মহিমা বাড়বে বই কমবে না।...তাছাড়া মরিচ তার প্রাণের বন্ধু !

মাসি বলেছিল 'আচ্ছা দাদা ! একেবারে দুটো টিকিট কেটে আনবে ? সে রাজি হবে কিনা—'

মামা বলেছিল, 'সে হয়ে যাবে ! আমি বলে কয়ে—'

॥ ৫ ॥

তা হয়ে গেল। লঙ্কার মামার খরচে কাশীতে মাসির বাড়ি গিয়ে গুলজার ! শুনে মরিচ তো একপায়ে খাড়া !

মরিচের মা-ও মহাখুশি।'ভালই হল ! দিদিকে একটা কিছু পাঠাবার সুবিধে পাই না। দারুণ শুদ্ধাচারী মানুষ তো ! অথচ আমার হাতের খাবার-টাবার খেতে কত ভালবাসে।...এ তোরা নিজেরা যাচ্ছিস ! ভাল করে নিয়ে যাবি।'

তারপর যথাদিনে যথাসময়ে মরিচের নিজের সুটকেস, ট্রেনের জন্যে চাদর বালিশ, আর মাসির জন্যে ওই বিশুদ্ধ টিনের সুটকেস নিয়ে আবির্ভাব।

আর তারপর ?...তারপর লঙ্কার চুলে কলকাত্তাই ছাঁট দিয়ে, ইচ্ছে করে গড়িয়ে দেরি করে, স্মার্টভাবে, ঘড়িতে ছটা বাজার পর, মামা-মাসিকে 'টা-টা' করে বিজয় অভিযানে বেরিয়ে পড়া ! সঙ্গে একটা ছোট ভাই !

উঃ ! কী স্ফূর্তি ! কী আহ্লাদ ! স্বাধীনতার এত সুখ। সাবালকত্বর এত মুক্তি ! এই সুখ-আহ্লাদ-মুক্তি থেকে এতদিন বঞ্চিত ছিল লঙ্কা ?

লঙ্কার বোজা চোখের সামনে দিয়ে ঘটনাপ্রবাহ বয়ে যাচ্ছে।...তারপর ? তারপর রাস্তায় জ্যাম, মিছিল, ট্যাক্সির টায়ার পাংচার, মনের মধ্যে একশো কুড়ি কিলোমিটার বেগে ঝড়। অবশেষে কোনোমতে—

কিন্তু যদি ওই ট্যাক্সিটা না জুটত, যদি ওই কিম্ভূতকিমাকার দেহাতি লোক দুটো হঠাৎ মনের গতি পরিবর্তন করে নেমে না পড়ত !...যদি বেনারসের গাড়িটায় হঠাৎ

যান্ত্রিক গোলযোগ না ঘটে ঠিক সময় ফস্ করে বেরিয়ে যেত। যদি ট্রেন ফেল করে বাড়ি ফিরে যেতে হত! তাহলে এখন লঙ্কার কী অবস্থা হত? মুখ বলে কিছু থাকত?...

'এই লঙ্কা, রেস্ট নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? আমার যে এদিকে পেটের মধ্যে বুনো শেয়ালে যোগব্যায়াম শুরু করে দিয়েছে। তোর মাসি কী সব দিয়েছে জানি না, বন্ধ কৌটোর মধ্যে থেকেই যা মার্ভেলাস সুরভিসুবাস পাওয়া যাচ্ছে। জিভে জল আসছে। আর পারা যাচ্ছে না।'

শুনে লঙ্কা তড়াক করে লাফিয়ে উঠল। আরে তাই তো, তার পেটের মধ্যেও তো মুগুর ভাঁজা চলছে! বেরোবার আগে অবশ্য মাসি দুটো পেটকে বালিশে তুলো ঠাসার মতো লোডেড করে দিয়েছিল।...কিন্তু সে কি এখনকার কথা?

তড়াক করে উঠে পড়ে লঙ্কা বলে উঠল, 'ও হোহো,...এই, এই সাবধানে বার করিস খাবারগুলো, যেন বালি লেগে যায় না।'

'বালি? বালি মানে? বালি কোথা থেকে আসবে?'

'ওঃ। ওটা হচ্ছে মাসির মৌলিক আবিষ্কার। খাবার বেশিক্ষণ তাজা থাকবে বলে মাসি তলার বাটিটায় আচ্ছা করে ভাজা গরম বালি ভরে রাখে।'

'আরে তাই নাকি? তাই মাত্র দু'জনের জন্যে এত বৃহৎ একটা কৌটো!...লঙ্কা রে! দেখেছিস? মাংসের চপ, ফিশ ফ্রাই, ডিমের পরোটা, আলু-মটরের ঘুগনি, পাটিসাপটা, মালাই চমচম! কত রে! আমরা কি বকরাক্ষস নাকি?'

'বাঃ! বাঃ! বলছিস আবার সেঁটেও তো ফিনিশ করে আনছিস! ব্রেকফাস্টের জন্যে কিছু রাখলে হত না?'

'ব্রেকফাস্ট? আছিস কোথায়? এই দ্যাখ, তার জন্যে আরও একটা গোল কৌটো।'

'তাই বুঝি? কী আছে ওতে?'

'দেখে রেখেছি! হি-হি—জিবেগজা! কুচো নিমকি! চিঁড়ে-ভাজা!'

'ব্যাস! নিশ্চিন্দি! শুয়ে পড়া যাক।

এরা তাহলে এল না ?'

'কই আর ? স্টেশনে স্টেশনে গাড়ি থামছে আর আমি ভয়ে মরে থাকছি। যদি হঠাৎ এসে যায় ! তাহলেই তো সুখ খতম !

'লোক দুটো কী ল্যাবাকান্ত রে লঙ্কা ?' মরিচ হেসে হেসে বলে, 'এত টাকা খরচা করে ফার্স্ট ক্লাস বার্থ রিজার্ভ করে কিনা ট্রেন ফেল করল ? ভাবা যায় ?'

লঙ্কা বলতে যাচ্ছিল,/ 'তা আমরাও তো—'

থামিয়ে দিল মরিচ, 'থাম তো-! আমাদের কেস আলাদা !...যাক আমাদেরই মজা ! বেওয়ারিশ দুটো বার্থ পেয়ে যাওয়া ! ভাবা যায় না !'

হাত মুখ ধুয়ে এসে, আবার দরজার লকটা ভাল করে দেখে নিয়ে আরামে

গড়িয়ে পড়ে দুজনে। আঃ ! গাড়ির দোলানিটা কী মধুর ! দু'মিনিটে ঘুম !

গাড়ি গুমগুম করে ছুটতে থাকে।

ওদিকে লঙ্কাদের অনেক দূরে ফেলে আসা হাওড়া ব্রিজের কাছের সেই জায়গাটায় তখন একটু কোনাচে মতো গলির মুখে একখানা খণ্ডযুদ্ধ ঘটে গেছে। গলায় গলায় দুই বন্ধু হঠাৎ হিংস্র হয়ে গিয়ে 'তোর দোষ তোর দোষ' করে কথা-কাটাকাটি থেকে হাতাহাতি, হাতাহাতি থেকে ঘুষোঘুষি, ঘুষোঘুষি থেকে নাক-ফাটাফাটি, তারপর ছুরি-বার-করাকরি আর তারপর হঠাৎই আবার ছুরি খাপে পুরে ফেলে নাকের রক্ত মুছে দুজনে গায়ে গায়ে ঘেঁষে বসে হতাশভাবে গভীর পরামর্শয় বসে গেছে। গভীর-গোপন !

কে ওরা ? কেন ওরা ? কিসের জন্যে যুদ্ধ ওদের ?

॥ ৬ ॥

লঙ্কার মাসি যদি একখানি তেজপাতা, তো লঙ্কার পিসি একখানি স্পেশাল বৃহৎ

সাইজের স্পঞ্জ রসগোল্লা।...গোল্লাগাল্লা সাদা ধপধপে হাসির রসে একেবারে টইটম্বুর ! আর মরিচ যতটা বলেছে, মোটেই ততটা নয়।...এদের দেখে তো থপথপিয়ে ছুটে চলে এসে দু হাতে দুটোকে সাপটে জড়িয়ে ধরলেন।

'ও মা ! ও মা। বীর হনুমান দুটো এসে পড়লি তাহলে ? আমি তো ভেবেই মরছিলাম মামা ছাড়বে কিনা।'

মরিচ হেসে উঠে বলে, 'যা একখানা চিঠি ঠুকেছিলে বাবা ! ছাড়বে না ? দেখেছি সে চিঠি।'

'হা হা ! হি হি !...দেখলি তো ? কেমন সাহস করিয়ে দিলাম !..ও ডঙ্কা ! কোথায় বসে আছিস রে ? আয় আয়, দেখে যা কারা এসেছে ! এদেরকে বাগানে নিয়ে যা ! চানের আগে যত পারে ধুলো ঘেঁটে আসুক, আর আম ঠেঙিয়ে আসুক।...ওরে ও গজানন ! কোথায় গেলি রে মুখপোড়া ? দেখতা হ্যায় না হামারা ভাইপো আতা হ্যায় বোনপো আতা হ্যায়।'

গজানন ট্যাক্সি থেকে এদের জিনিসপত্রগুলো নামিয়ে দু'হাতে করে নিয়ে আসছিল, গম্ভীরভাবে বলল, 'মা যে কেন এখনো এত কষ্ট করে হিন্দি বলেন। গজানন তো আপনার থেকেও ভাল বাংলা বলে।...এসব কোথায় রাখব বলুন ?'

'কোথায় আবার ? হামারা মাথায় ! যা দাদাবাবুর ঘরমে রাখগে। ··· আরে ডঙ্কাটা গেল কোথায় ?' এদের বাগানে নিয়ে যাক। হ্যাঁ রে, কবে আসছিস, কোন্ গাড়িতে। সেটা জানাবি তো ? যাক গে, আজকে যা জুটবে খাবি। ···অ ডঙ্কা ! কী জ্বালা ! গেল কোথায় ?' স্পঞ্জ রসগোল্লা যেন আহ্লাদের চোটে হাঁসফাঁস করতে থাকেন।

ডঙ্কা বোধহয় বাড়ির পিছনে আমবাগানেই ছিল, শোরগোলের আভাস পেয়ে চলে এসেই দাঁড়িয়ে পড়ে বিচ্ছু হাসি হেসে বলে ওঠে, 'কী রে লঙ্কা, এতদিনে তাহলে মানুষ হলি ? আয় তো দেখি পাঞ্জা লড়ি।'

ডঙ্কার হাসি দেখে একটু রাগ এসে যায় লঙ্কার, বলে ওঠে, 'তুই বা কই একবারও কলকাতায় গিয়েছিস ?'

'আমি ? আমি গেলে এই বালিকাটিকে কে দেখবে ? একা থাকতে পারবে ?' বলে দেবলারানী চৌধুরীর দিকে তাকিয়ে হি-হি করে হাসতে থাকে। ···'কই ? আয় ? পাঞ্জা লড় একবার।'

মরিচ ওদের দু'জনের দিকে তাকিয়ে বলে, 'পাঞ্জা রাখ তো। দুজনে পাশাপাশি দাঁড়া তো, দেখি কার কত হাইট্ !'

'দূর, লঙ্কাটা তো পুঁচকে।'

বলে সগৌরবে এসে পাশে দাঁড়িয়ে পড়ে ডঙ্কা ! কিন্তু গৌরব ধূলিসাৎ ! মাথায় মাথায় একেবারে এক ! একচুলও এদিক-ওদিক নয়।

মরিচ নিরীক্ষণ করে দেখতে দেখতে বলে ওঠে, 'তাজ্জব তো ! একেবারে এক !'

ডঙ্কা আর পাঞ্জা লড়ার কথা বলে না। কী জানি আবার যদি গৌরব ধূলিসাৎ হয় ? বলে, 'ছুটিতে এসেছিস তাও এত বই নিয়ে ? কী গুড বয় রে বাবা !'

'ওগুলো কি পড়ার বই নাকি ?'

'ওঃ ! গল্পের বই, রূপকথা-টথা নয় তো ?'

মরিচ তাড়াতাড়ি বলে, 'ধ্যেত ! স্রেফ তো গোয়েন্দা-গল্প ! লঙ্কাটা তো গোয়েন্দা গল্পর পোকা ! আমিও অবশ্য !'

ডঙ্কা অবজ্ঞাভরে বলে, 'তার মানে যত সব রাবিশ মাল দিয়ে ব্রেনটা ভর্তি করা ! গোয়েন্দা-গল্প মানেই তো একজন অসাধ্যসাধক ! সব সময় যার কানের পাশ দিয়ে গুলি চলে যায় ? এসব আজগুবি পড়ার কোনো মানে আছে ?'

লঙ্কা বইয়ের থলেটার মুখ মুড়ে ফেলে

রেগেমেগে বলল, 'ঠিক আছে। তোকে তো কেউ পড়তে বলেনি।'

'বললেও পড়তাম না। তার থেকে আমবাগানের হনুমান তাড়ানো ভাল। যাবি তো চল। পিসি যা অস্থির হচ্ছে!'

লঙ্কাকে ডাউন করতে পেলেই যেন ডঙ্কার যত আহ্লাদ। কেন—দুজনের মধ্যে সম্পর্কটা কী?

দু'জনের পিসি তো একই লোক। দুজনের মাসিও। তবে?

দু'জনের গায়ে একই রকমের জামা কেন? একই লোক সাপ্লাই করে নাকি? তা করে। মামা যখন দেয় একই জোড়ার, পিসি যখন দেয় অবিকল এক।

॥ ৭ ॥

আমবাগান ঠেঙিয়ে এসে তিনজনে যখন শোরগোল তুলেছে কে কতগুলো পাড়তে পেরেছে, তখন দেবলারানী থপাস থপাস করতে করতে এগিয়ে আসেন, 'হ্যাঁ রে মরিচ, তোর মা যে চিঠিতে লিখেছে, মরিচের হাতে তোমার জন্যে বিশুদ্ধ করে তালপাটালি, নারকেলের গজা, আদা দিয়ে সুজির ঝাল-বিস্কুট, সজনেডাঁটার আচার, আর কাঁচা তেঁতুলের মোরব্বা পাঠালাম—তা কই সে সব?'

'অ্যাঁ, সে কী?' মরিচ চমকে ওঠে, 'সেই টিনের সুটকেসটা তোমার ভাঁড়ারঘরে নামায়নি? বলে দিলাম যে তোমার ওই খাজা না গজাকে?'

'ওর কথা বাদ দে! ট্যাক্সি থেকে নামিয়েছে কিনা তাই বা কে জানে!'

'নিয়ে কেন আসবে না?'

গজানন মদগর্ব ভাবে বলে, 'আলাদাই রেখেছে গজানন।' তেমনি মদগর্ব ভাবেই ডঙ্কার ঘরে ঢুকে যায়। এবং সুটকেসটাকে নিয়ে এসে দমাস করে বসিয়ে দেয়!

কিন্তু দেখে দুটো ছেলের চার চারটে চোখ পাথর হয়ে গেল কেন? পলক পড়ছে না কেন?

এ কী? এটা কী?

টিনেরই সুটকেস! আনকোরা নতুনও, কিন্তু পাতালতাসমেত লাল টকটকে গোলাপফুলটা রাতারাতি একটা কটকটে কালো-হলুদরঙা হাঁ-করা বাঘের মুখ হয়ে গেল কী করে?

লঙ্কা মরিচ কি স্বপ্ন দেখছে? নাকি ওই ওস্তাদ ডঙ্কাটা পি· সি· সরকারি বিদ্যে-টিদ্যে জানে কিছু? ...সুটকেসটার গায়ে আবার একটা তালাচাবি।...

নাঃ, মাথাটা বনবন করে ঘুরে ওঠে ছেলে দুটোর!

লঙ্কা!

মরিচ!

গাড়িটা কি তাহলে ভৌতিকই ছিল?

মুখে অবশ্য কথা নেই, চোখে চোখে আর মনে মনে প্রশ্ন!

পিসির মুখে কিন্তু হাসির ঘটা, 'কে এটি কিনেছে রে মরিচ? তোর বাবা বোধহয়? তাই এমন বাঘা পছন্দ! দে চাবিটা দে।'

চাবি!

মরিচের পায়ের তলায় মাটি নেই, চোখের সামনে আলো নেই। তবু মরিচ ভান করে প্যান্টের পকেট হাতড়ায়।

'কী? হারিয়েছিস বুঝি? নাকি আনিসইনি। টেপা তালার এই দোষ! কটাং করে আটকে ফেললেই হল। হয়তো বাক্সর মধ্যেই শুয়ে আছেন চাবি! ...দেখি আমার চাবির থোলো থেকে যদি—গজা, রান্নাঘরের তাকে আমার চাবির থোলোটা আছে আন তো!'

গজানন চাবি আনার বদলে এসে জানাল বাইরে মস্ত একখানা গাড়ি চড়ে ভারী জোরদার একটা বাবু এসে বলছে, কলকাতা থেকে যে দুটো ছোকরাবাবু এসেছে, তাদের সঙ্গে দেখা করবে!

'এই দ্যাখো জ্বালা ! এক্ষুনি জানা হয়ে গেল কলকাতা থেকে · বাবু এসেছে ! লঙ্কা ! এ নির্ঘাত তোর মামার কোনো বন্ধু-টন্ধু ! ভাগ্নেকে পিসির কাছে পাঠিয়ে স্বস্তি নেই, বন্ধুকে ট্রাঙ্ক-টেলিফোন-টোন করে খবর নিতে বলেছে ! ...এক্ষুনি না আবার বলে বসে, ওর বাড়িতে নেমন্তন্ন খেতে চলুক ! যত সব ঝামেলা ! ডঙ্কা, দেখগে দিকিনি । বলবি, সে এখন টায়াট ! কী বলবার আমায় বলুন ।'

লঙ্কা ভেবে পায় না বেনারসে আবার মামার কে বন্ধু আছে !

ডঙ্কা গটগটিয়ে চলে যায় ।

যাবার সময় মুচকি হেসে বলে যায়, 'কী রে লঙ্কা, তাই তাই তাই মামার বাড়ি যাই । মামার বন্ধু তো মামাই !'

একথোলো চাবিতে বিফল হয়ে দেবলারানী রেগেমেগে বলেন, 'এই গজা, তোর যন্তরপাতি লে কে তালাচাবি ভাঙ দেও তো—'

এরকম কাজে গজানন একপায়ে খাড়া !

সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে একগাদা জিনিস এনে হাজির করে । বাটালি, হাতুড়ি, স্ক্রু-ড্রাইভার, সাঁড়াশি ।

তারপর আর কী ?

মুহূর্তে তালাসমেত ডালাটাই হাঁ করে ফেলে ।

আর স্পঞ্জ রসগোল্লা সঙ্গে সঙ্গে, 'এ মাঃ ! এ মা ! এ কী ইল্লুতে কাণ্ড ! মরিচ ! এ কী ?' বলে সাত হাত পিছিয়ে আসেন ।

কিন্তু মরিচেরই কি সাড় আছে ?

মরিচ নিজের চক্ষে দেখেছে খাবার-টাবার ঠেসে মা তার ওপর একটা নতুন সিল্কের রুমাল ঢাকা দিয়ে তার ওপর চারটে তুলসীপাতা ছড়িয়ে দিয়ে রেখেছিল । ওটা নাকি দূষণ শোধন ।...

সে জায়গায় এখন কী দেখছে মরিচ ?

ভগবান জানেন তলায় কী আছে, তবে দেখছে ওপরে চাপা রয়েছে একটা পাট-করা ময়লা লুঙ্গি, আর তার ওপর দু' বাণ্ডিল বিড়ি !

স্পঞ্জ রসগোল্লার গলায় বজ্রনিনাদ, 'লঙ্কা ! মরিচ ! গাড়িতে কাদের সঙ্গে বাক্সবদল করে মরেছিস ?'

মরিচের গলায় স্বর নেই ।

লঙ্কার ক্ষীণ কণ্ঠ, 'কাঁর সঙ্গে আঁবার ? গাঁড়িতে তো কেঁউ ছিঁলই না ।'

'ভূতের মতন নাকে কথা কইছিস কেন ? গাড়িতে কেউ ছিল না মানে ? 'কুপি' গাড়িতে এসেছিস নাকি ?'

'না ।...নীচের দুজনরা আসেনি । গাড়ি ফেল করেছিল ।'

'তা নয় ছিল । ভূত ছিল, যে ভুতুড়ে গাড়ি ! নইলে বাক্সটা বদল হয় কী করে ?...এই গজা, টেনে দেখ দিকি তলায় কী আছে !'

শুনে গজানন আহ্লাদভরে বিড়ির বাণ্ডিল দুটো সাবধানে সরিয়ে রেখে, হ্যাঁচ্‌কা টানে লুঙ্গিটা সরিয়ে ফেলল !

আর তারপর, 'আরে বাপ রে, রাম রাম সীতারাম' বলে ছিটকে দশ হাত পিছিয়ে উল্টেপাল্টে পড়ে গেল ।

আর বাকিরা ?

প্রায় বজ্রাহত ।

কেন ? কী ছিল তাতে ?

কুণ্ডলি-পাকানো সাপ ? না কি মড়ার মাথা ?

কারোর মুখে কথা নেই ।

কিন্তু ডঙ্কা ?

ডঙ্কা এতক্ষণ ধরে বাইরে লঙ্কার মামার সেই বন্ধুর সঙ্গে কী এত কথা কইছে ? 'এই গজা, দেখগে যা তো !'

গজানন ছুটে বেরিয়ে গেল, আর তক্ষুনি ছুটে ফিরে এসে দুহাত উল্টে যা বলল, তার মানে হচ্ছে বাইরে কোনো বাবুও নেই, গাড়িও নেই, দাদাবাবুও নেই ।

॥ ৮ ॥

হায় ! হায় ! কোথায় বেনারসি ল্যাংড়া খেয়ে মোটা হওয়া, কোথায় পিসির আদরে-গোবরে তিন-তিনটে ছেলেতে মিলে গুলজার করা তা নয়, কিনা দিকে দিকে সবাই ছুটতে যায় হারিয়ে যাওয়া ছেলেটাকে খুঁজতে !

কী আশ্চর্য !

লঙ্কা এল আর ডঙ্কা হারিয়ে গেল ! ...অথচ এই কাশী শহরে চিরটাকাল আছে ডঙ্কা ! হারাবে মানে ?

বেচারি ডঙ্কাও সেই প্রশ্ন করে, 'এর মানে ? হঠাৎ আমায় ক্যাঁক করে গাড়িতে তুলে ফেলে যতদূর ইচ্ছে নিয়ে যাচ্ছেন মানে ?'

'মানে ? ইস্, ফাজিল ছোকরা আবার মানে জানতে চায় ! মানে বোঝাচ্ছি গিয়ে চল্ না একবার ! গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে মানে বোঝাব ।'

বিরাট গাড়িবান লোক ।

লোকটার পরনে ফুল কোঁচানো মিহি ধুতি, গায়ে দারুণ কল্কাদার আদ্দির পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবিতে মুক্তো বসানো ঝকমকে সোনার বোতাম, আঙুলে হিরের আংটি । চেহারাও দিব্যি খানদানি । ফর্সা রঙ, বড়লোক-বড়লোক চেহারা, অথচ মুখের কথা কী বিচ্ছিরি !

ডঙ্কা বলল, 'আমায় কিডন্যাপ করে নিয়ে যাচ্ছেন ? যদি চেঁচাই ?'

'চেঁচাবি ? হা হা হা ! চেঁচিয়ে দ্যাখ না ।'

ডঙ্কা তার চোখের ইশারায় দেখে, সঙ্গের আর একটা লোক ডঙ্কার বুকের কাছ বরাবর একখানা ছোরার আগা উঁচিয়ে বসে আছে । তার মুখের হাসিটাও ছোরার আগার মতোই ।

ডঙ্কা তো জ্ঞানাবধিই এই কাশী শহরে,

তবু বুঝতে পারে না, কোথা দিয়ে কোথায় নিয়ে গিয়ে তাকে বিচ্ছিরি একটা অন্ধকূপ বাড়ির মধ্যে ছোট্ট একটা ঘরে পুরে ফেলল।

কী ঘিঞ্জি গলি! কী পচা বাড়ি।

সেই হিরের আংটি পরা লোকটা অবিশ্যি এ বাড়িতে থাকল না, রইল সেই ছোরাধারীটা!

হিরের আংটি শুধু বলে গেল, 'এই মতিলাল, আজ সারা দিন-রাত ছোঁড়াকে কিছু খেতে দিবি না, জল পর্যন্ত না।...দেখি কাল কেমন না কথা আদায় হয়। আর কাল তো ওরা এসেই যাচ্ছে। তারপর দেখা যাবে মাল আদায় হয় কিনা।'

ডঙ্কার সব বীরত্ব উপে যায়। হাউহাউ করে কেঁদে ফেলে বলে ওঠে, 'কেন আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন না? বলছি আমি মোটেই কলকাতা থেকে আসিনি, চিরকাল এখানেই আছি। বিজয়নাথ অ্যাকাডেমির ক্লাস নাইনের ছাত্র। আমার ঠাকুর্দার নামে স্কুল। আমার বাবা—'

ছোরাধারীটা খ্যাঁক খ্যাঁক করে হেসে বলে, 'ও গুরু! বিচ্ছু ছোঁড়া আবার বাপ-ঠাকুদ্দা দেখাচ্ছে!'

'এখন অনেক কিছুই দেখাবে। এরপর আবার যখন নিজে চোখে সর্ষেফুল দেখবে, তখন বাপ বাপ করে মাল বার করে দেবে।...তো এই ছোঁড়া, তোর সঙ্গে যে একটা কেলে কুচ্ছিত শুঁট্‌কো ছোঁড়া এসেছিল, সেটা কোথায়? ওই বাড়িতেই আছে, না মাল পাচার করতে আর কোথাও ভেগে গেছে?'

'বলছি আমি কোথাও থেকে আসিনি, চিরকাল এখানেই আছি। জিজ্ঞেস করুনগে না আমার মাস্টারমশাইদের।'

'তা আর নয় জাদু। জিজ্ঞেস করতে যাব।...ঠিক আছে, আজ ইঁদুরকলে পড়ে থাকার মতো উপোস করে পড়ে থাক, কাল আসল যমেরা আসছে!'

ডঙ্কা বেচারি ভেবে পায় না হঠাৎ হলটা কী! কে জানে এ জায়গাটা কী! গঙ্গার জলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে মাঝে-মাঝে, কিন্তু কাশীতে কোথায় বা গঙ্গা নেই?

॥ ৯ ॥

'আচ্ছা মরিচ, বাক্সটার রহস্যটা কী মনে হয় তোর? কখন কীভাবে—'

'সেইটাই তো বোঝা যাচ্ছে না লঙ্কা! তবে বড়মাসিকে তো আর ঠেকিয়ে রাখা যাচ্ছে না। পুলিশে খবর না দিয়ে ছাড়বে না।'

'পুলিশ? তার মানে সপরিবারে শ্রীঘর, আর ওই বাক্সটি থানাবাবুদের পেটে। ...অথচ দ্যাখ, ফেলুদা থাকলে কত সহজেই ব্যাপারটার ফয়সালা হয়ে যেত।'

মরিচ বলল, 'কর্নেল নীলাদ্রি সরকার হলেও চলত!'

'যা বলেছিস। আবার গোয়েন্দা-গল্পে আমাদের মতো বয়েসের ছেলেরাও তো কম যায় না? ট্যাঁপা আর মদনা নামে দুটো হাড়মুখ্যু ছেলেও তো সেবার রাঁচিতে গিয়ে—পাগলাগারদ-ফারদ নিয়ে—'

'তার আগেও কলকাতাতেই কোন্ যেন একটা উকিলের হত্যা-রহস্যের কিনারা করে ফেলেছিল। ওরাই তো?'

'কাকাবাবুর ভাইপো সন্তুও কিছু কম যায় না। আমাদের মতোই বয়েস! অথচ আমরা কিছুই করতে পারছি না!'

লঙ্কা একটা নিশ্বাস ফেলল।

'তুই যে বলছিলি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিলে হয়, "একটি বাঘছাপ মার্কা টিনের সুটকেস কিছু জিনিসপত্র সহ পাওয়া গিয়াছে, উপযুক্ত প্রমাণ দেখাইতে পারিলে ফেরত পাইবেন"।'

মরিচের কথায় লঙ্কা মনমরা গলায় বলে, 'ভেবেছিলাম। দেখি! আসলে তো ঠিক

বোঝা যাচ্ছে না ব্যাপারটা কখন কোথায় ঘটল ! আর সে অ্যাডভার্টাইসমেন্ট কার চোখে পড়বে !'

মরিচ বলল, 'মাসি তো বলছে, ওই পাপ বাক্সটা গঙ্গায় ফেলে দিতে !'

'তা আর নয় ? জলে জলপুলিশ নেই ? জলে মাল ফেলতে দেখলে কানটি ধরে থানায় নিয়ে যাবে না ? উঃ ! ডঙ্কাটার জন্যে এত খারাপ লাগছে। এতদিন পরে দেখা হল ! ...আহা, ও বেচারিকে যে কেন লোপাট করে দিল !'

মরিচ গম্ভীরভাবে সবজান্তা গলায় বলল, 'পিওর কিডন্যাপ আর কী ! মাসির কাছ থেকে হুমকি দিয়ে টাকা আদায়ের ফন্দি ! জানে তো অনেক টাকা আছে !'

'কী অদ্ভুত ব্যাপার দ্যাখ ! সুটকেসটা কীভাবে বদলে গেল, আমরাও এলাম আর ডঙ্কাটা লোপাট হয়ে গেল, বাঘছাপের মধ্যে ওই অসম্ভব মাল, কিসের সঙ্গে কিসের সূত্র বোঝাও যাচ্ছে না ! অথচ একসঙ্গে ঘটে গেল ঘটনাগুলো ! তবে এখন ব্যাপারটা পুলিশের হাতে তুলে দিলে সব গুবলেট হয়ে যাবে, আর ওই যা বলেছি, বাঘমুখটি চলে যাবে তাঁদের গহ্বরে। ...এখন ডঙ্কাকে উদ্ধার করাই হচ্ছে আমাদের প্রধান কাজ। ও সুটকেসের কথা পরে ভাবলেও চলবে। পিসির হেফাজতে আছে তো ভাল করে ?'

'তা তো আছে। কিন্তু মনে হচ্ছে গজাননটা যেন আমাদেরই সন্দেহ-সন্দেহ করছে ?'

লঙ্কা উগ্রমূর্তিতে বলে, 'আমাদের সন্দেহ করছে ?'

'মনে হচ্ছে কেমন করে যেন তাকাচ্ছে।'

'ও তোর মনের ভুল।'

রাস্তায় চলতে চলতেই কথা হচ্ছিল, হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লঙ্কা, 'আচ্ছা মরিচ, তোর গোলাপ-ছাপ সুটকেসটা গাঁইয়া বলে মামা যে কাগজে মুড়ে দিয়েছিল, সেই কাগজটা কখন থেকে দেখা গেল না বল তো ?'

'ওই তো ট্রেনে উঠে। যদি ইয়াসিন ফিয়াসিন ঢুকে পড়ে জুতো ঠেকায় বলে উঁচুতে তুলতে গিয়ে।'

'তখন ছাপ দেখেছিলি ?'

'মাথা খারাপ ! তখন আবার কে অত দেখতে যাচ্ছে !'

'তার মানে যা হবার ওই সেকেণ্ড ট্যাক্সিটাতেই হয়েছে।'

'বাঃ ! দেহাতি লোক দুটো নেমে চলে গেল, তারপর আমরা উঠলাম। বদলটা কখন হল ? ওদের হাতে তো কিছু ছিলও না।'

'ওই তো ! আসলে ওরা হুড়মুড়িয়ে খালি হাতেই নেমে গেল, বাঘমুখ ট্যাক্সিতেই পড়ে রইল। আর আমরাও আমাদের কাগজমোড়াটা ট্যাক্সিতেই ফেলে রেখে ওদেরটা নিয়ে—'

'অ্যাঁ। তাই বলছিস !'

'বলছি। এছাড়া আর কী হবে ? কী হতে পারে ?'

'ও-রকম জিনিস কেউ ভুলে ফেলে রেখে নেমে যায় ?'

'ভুল, ভুলই ! হয়তো চেক-লুঙ্গি ভেবেছে চোঙা-প্যান্ট নিয়েছে, চোঙা-প্যান্ট ভেবেছে চেক-লুঙ্গি নিয়েছে !'

'আরে লঙ্কা ! তোর মাথাটা তো বেশ পরিষ্কার।'

'দূর ! এক্ষুনি মাথার জয়গান করিস না। শেষমেশ কী হয় দেখা যাক ! এখন—আসল সমস্যা ডঙ্কা !'

হঠাৎ তাকিয়ে দেখল এক ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তাদের দিকেই এগিয়ে আসছেন। বাঙালিই, তবে কেমন যেন অবাঙালি গোছের ভাব। তাড়াতাড়ি কাছে এসেই লঙ্কার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই

একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহারে থাকা উচিৎ সব কটি পুষ্টিকর উপাদান ঠিক ঠিক পরিমাণে...

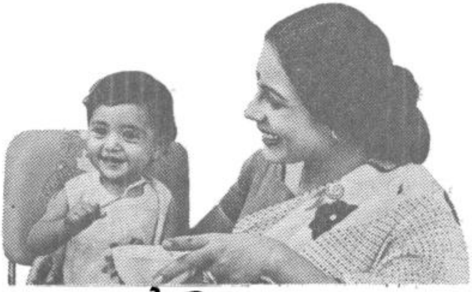

সেরেল্যাক একটি পুষ্টিকর সম্পূর্ণ শিশু আহার —যা অত্যন্ত সুস্বাদু

যখন আপনার বাচ্চার বয়েস প্রায় চার মাস আর সে শক্ত খাবার খেতে তৈরী তখন, সেরেল্যাক সম্বন্ধে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন। প্রতিবার সেরেল্যাক খাওয়ানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ পুষ্টিকর খাবার পড়ছে জেনে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন।

অর্থাৎ, শক্ত আহারের মাধ্যমে বাচ্চার যে পরিমাণ প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর উপাদান, প্রোটিন ও ক্যালোরী পাওয়া উচিৎ তা আছে সেরেল্যাকে। বাচ্চার পরিপূর্ণ পুষ্টির জন্যে আপনাকে আর অন্য কোনও খাবার দিতে হবেনা।

পুষ্টি ও স্বাদে ভরপুর সেরেল্যাকে আছে গমের আটা, মালাইদার দুধ ও চিনির এক সুস্বাদু মিশ্রণ। সেরেল্যাকে আছে শরীর গঠনের উপযোগী প্রোটিন, প্রাণচঞ্চল শক্তির জন্যে কার্বোহাইড্রেট ও ফ্যাট আর সুস্থ-সবল বেড়ে উঠার জন্যে প্রয়োজনীয় সব রকমের ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।

আপনার বাচ্চার সম্পূর্ণ, স্বাভাবিক সুস্বাস্থ্যের জন্যে তাকে সেরেল্যাক দিন!

সেরেল্যাক.

এতে দুধ মেশানো আছে

সেরেল্যাক তৈরী করে নেওয়া কি সোজা! শুধুমাত্র আগে ফোটানো কুসুম-গরম জল ঢালুন! মিশিয়ে নিন, নাড়ুন আর খেতে দিন!

SAA/FSL/C/2670 BEN

NESTLÉ

যে পূর্ণেন্দু, তোমার হঠাৎ কী হল ? পরশুদিনকে ছুটির আগের ফাংশানে এলে না, গতকাল তোমাদের বাংলার মাস্টারমশাইয়ের ফেয়ারওয়েল হয়ে গেল। উনি তোমায় কত ভালবাসতেন। ...আজ তো ছুটিই হয়ে গেল !'

পূর্ণেন্দু !

মরিচ জানে না 'পূর্ণেন্দু' কে ! তবে লঙ্কা জানে। লঙ্কার ভাল নাম পূর্ণেন্দু। যেমন লঙ্কার ভাল নাম স্বর্ণেন্দু !

লঙ্কার চোখের সামনে থেকে একটা অন্ধকারের পর্দা সরে যায় ! লঙ্কা জট-পাকানো গুলিসুতোটার একটা খেই হাতে পেয়ে যায়। সে ঘাড় নিচু করে বিজবিজিয়ে বলে, 'শরীরটা তেমন ইয়ে ছিল না।'

'হ্যাঁ, তাই দেখছি, মুখটা শুকনো শুকনো লাগছে। দেখো বাবা, সাবধানে থেকো।'

তাড়াতাড়ি চলে গেলেন। হাতে বাজারের থলি।

'লোকটা কে রে ?'

'দেখলি তো একজন স্কুলমাস্টার।'

ওরা ভাবছে কোন্ দিকে যাবে। হঠাৎ মরিচ চাপা গলায় আঁতকে উঠল, 'লঙ্কা !'

'চুপ ! চেঁচাসনি। অন্যদিকে ঘুরে হাঁটা মারতে শুরু কর !'

'তুই দেখতে পেয়েছিস ?'

'পাব না, কেন ? ভগবান কি শুধু তোকেই চোখ দিয়েছেন ?'

'ইস, ওদের ফলো করলে হত না লঙ্কা ?'

'থাম্ ! পাকা ঘুটি কাঁচাতে চাস ?'

'রিকশ থামিয়ে সিগারেট কিনছিল না রে ?'

'ওটা ছলও হতে পারে। হয়তো আমাদের দেখতেই—এই এত জোরে জোরে হাঁটছিস কেন বোকার মতো ? আমরা কি পালাচ্ছি নাকি ?'

'কিন্তু ওরা যে কোন্‌দিকে গেল জানা হল না।'

লঙ্কা বলল, 'হবে ! হবে ! সব হবে !'

'কী করে ?'

'দোহাই তোর মরিচ, একটু ভাবতে দে ! ট্যাক্সির যেমন নম্বর থাকে, রিকশরও তেমনি বাহারি বাহারি সব নাম থাকে তা জানিস ?'

'রিকশর নাম ? থাকে তো। কিন্তু তাতে কী ?'

মরিচ মাথা চুলকোয়।

॥ ১০॥

বেনারসের একটি অভিজাত পাড়ায় দিব্যি বিরাট একখানা বাড়ি। সামনে বাগান, গ্যারেজে মস্ত গাড়ি। সকালবেলা বাড়ির মালিক বড় বিজনেসম্যান হরিলাল তালুকদার বাগানের ধারে বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন আর সিগারেট খাচ্ছেন। পরনে মিহি কোঁচানো শান্তিপুরি ধুতি, বুকের বোতাম খোলা, কল্কাদার পাঞ্জাবির বোতামঘরে মুক্তো বসানো সোনার বোতাম চেনে লটকাচ্ছে, হাতে হিরের আংটি। চেহারা জৌলুসদার।

কাগজ পড়ছেন কিন্তু চোখ আছে রাস্তায়।

হঠাৎ বাড়ির সামনে একখানা রিকশগাড়ি দাঁড়াল ! তালুকদার একনজর দেখে নিয়েই, কাগজে গভীর মনোযোগ দিলেন।

রিকশ থেকে দুজন লোক নামল।

একজনের পরনে টকটকে লাল চেক লুঙ্গি, আর কটকটে নীল লম্বাঝুল পাঞ্জাবি। দুদিকে ঝোলা গোঁফ, মাথার মাঝখানে চেরা সিঁথি। অন্যজনের পরনে ক্যাটকেটে সবুজ চোঙা প্যান্ট, আরো ক্যাটকেটে হলদে রঙা শার্ট, গলায় আবার একখানা রঙচঙা রুমাল তিনকোনা করে বাঁধা !

লোক দুটো নেমে এসেই হুড়মুড়িয়ে কাছে এসে মাটিতেই বসে পড়ে বলল, 'এটা কী হল গুরু ? ট্রাঙ্ককলে আমাদের ফল্‌স্‌ খবর দিলেন ? বললেন, দুটোর মধ্যে একটা ছোঁড়াকে লটকে নিয়ে গিয়ে জাঁতিকলে ফেলে রেখে দিয়েছেন। আর আমরা স্বচক্ষে দেখলাম দুটো ছোঁড়া দিব্যি একসঙ্গে গোধুলিয়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে হাওয়া খাচ্ছে !'

'অ্যাই চোপ !' হিরের আংটি আঙুল তুলে বলল, 'খবরদার, যা-তা বলবি না। বেকুব বুদ্ধু বুড়বাক কোথাকার। যা করেছিস তারপর আবার কথা কইতে লজ্জা করছে না ?'

'সে আপনি সাতশো জুতো মারুন গুরু, তবে একথাটা আপনাকে মানতেই হবে ! নিজের চোখকে তো অবিশ্বাস করতে পারি না। সেই একটা ফর্সা নাদুসনুদুস আর একটা কেলে চিমড়ে ছোঁড়া গলায় গলায় দাঁড়িয়ে—'

'অসম্ভব !' হিরের আংটি লাল লাল মুখে বলেন, 'এই একটু আগে আমি মর্নিং ওয়াকে বেরিয়ে মতিলালের ডেরা ঘুরে এসেছি। কাল থেকে নির্জলা থাকায় চিঁ-চিঁ করছে ! তবে এখনো স্বীকার পায়নি, ত্যাঁদোড় আছে ! আচ্ছা করে ধোলাই দিতে বলে এসেছি।'

'ভুল করে অন্য কাউকে ধরা হয়নি তো স্যার ?'

'চোপরাও বুদ্ধু ! তালুকদার যাকে একবার দেখে তাকে জন্মে আর ভোলে না।'

'আপনি কি দেখেছিলেন গুরু ?'

'দেখিনি মানে ? ...ব্রিজের ধার থেকে আমি যখন তোদের ট্যাক্সি থেকে নেমে আসতে ইশারা করলাম, তখন ছোঁড়া দুটো হন্যে হয়ে খালি ট্যাক্সিটা ধরতে ছুটে এল না ?'

'হ্যাঁ, তা তো এল !'

'এল ! আর তোমরা ? বোকা বাঁদর উল্লুক, দুজনে খালি হাতে নেমে এলি কেমন ? ...আমি ব্যাটা ভাবলাম প্লেনে চলে যাচ্ছি, আমার সঙ্গেই মালটা চলে আসুক, আর তোরা কিনা ! গাঁট্টা মেরে মাথা ভেঙে দিলেও রাগ যায় না, বুঝলি, ...তবু ঠাণ্ডা মাথায় আছি ! আবার বলতে এসেছে কিনা তালুকদার ভুল লোককে ধরেছে !'

লাললুঙ্গি ঝোলা গোঁফটার মাঝখানটা আঙুলে চেপে ধরে কাতর গলায় বলল, 'প্রথমে তো গুরু আপনি বলেছিলেন প্লেনেই চেক-এর ঝামেলা, হঠাৎ যে কেন মত বদলালেন !'

'বদলালাম তুই ব্যাটাদের বুদ্ধির ওপর বিশ্বাস নেই বলে। এই তো হুঁশ। হয়তো রেলগাড়িতেই ফেলে রেখে ঝাড়া হাতপায়ে নেমে পড়তিস—যা যা, সামনে থেকে বেরো !'

'বেরোব গুরু, কিন্তু আপনাকেও একবার বেরোতে হবে। দোহাই আপনার ! গাড়ি নিয়ে চলুন একবার !'

'গিয়ে ?'

'নিজের চক্ষে দেখবেন। কিন্তু এটাকে আর রাখতে পারছি না গুরু, বড্ড কুট কুট করছে।'

বলে গোঁফটাকে টান মেরে খুলে ফেলে পকেটে পোরে।

চোঙাপ্যান্ট মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসতে থাকে।

॥ ১১ ॥

রিকশর নাম 'বাবা কালভৈরব'।

লাল অক্ষরে বড় বড় করে লেখা।

লঙ্কা তাকে হাতের ইশারায় ডাক দিয়ে মরিচকে বলল, 'দেখলি তো ? বললাম না রিকশাদের বেশ বাহারি নাম থাকে।'

রিকশওলাটা নেহাতই একটা ছেলে

মাত্র। ডাকামাত্রই গড়গড়িয়ে চলে এসে একগাল হেসে বলে উঠল — 'দাদাবাবুকে ক'দিন দেখা মিলছে না? ইস্কুলে ভি ঘটাভট্টা হল, গেলেন না? শরীর-উরির খারাপ?'

লঙ্কার মাথা ঘুরে গেল! সর্বনাশ! এখন তাকে ডঙ্কার পার্ট প্লে করে যেতে হবে! ...ঘাড় নেড়ে বলল, 'হুঁ! (খক খক খক) জ্বর কাসি! (খক খক খক)।'

'আরে! বহোত কাস হুয়া! ডাগদার দেখান।'

'দেখিয়েছি রে বাবা! (খক খক খক-মুখে রুমাল চেপে) দাওয়াই ভি খাচ্ছি!'

'হি হি দাদাবাবু হামার সাথ হিন্দি বোলছে! শুকদেব বাঙলা সমঝে না? ...তো বেমার নিয়ে যাবেন কুথাকে?'

'যাব—ওই যে একটু আগে (খক খক খক) দুটো লোককে (খক খক খক) নিয়ে গেলে? ...একটা লুঙ্গি, আউর একটা প্যান্ট?'

'হাঁ হাঁ, ওতো তালুকদারবাবুকো কোঠিমে গেল। বহোত বড়া বাবু। তো ও কোঠিমে কোন্ কাজ দাবাবু?'

লঙ্কা অলক্ষ্যে মরিচকে একটা চিমটি কেটে তার কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত করিয়ে মুখে রুমাল চেপে কাসতে কাসতে ডিকটেশান দেয়, আর মরিচ গড়গড়িয়ে বলে যায়, 'তোমার দাদাবাবুর কোনও কাজ নয়, কাজটা আমার। আমি এর মাসিকো ছেলে, সমঝা?'

'হাঁ হাঁ! মসতুতা ভাই তো?'

দাঁত বার করে হাসে ছেলেটা, 'আপনি বাংলামে বোলে যান না দাদা!'

অতএব মরিচ লঙ্কার টিপুনিতে যা বলে যায় তা হচ্ছে, সে দাদাবাবুর মাসতুতো ভাই, দুদিন হল কলকাতা থেকে এসেছে, ওই লোক দুটো তার বাবার চেনা, একসঙ্গেই আসার কথা! কিন্তু হাওড়া স্টেশনের ভিড়ে কোথায় যে হারিয়ে গেল! এখন হঠাৎ এক্ষুনি ওদের শুকদেবের রিকশাতে চলে যেতে দেখল, তাই ছুটে এসেছে। শুকদেব যদি নিয়ে যায়—

'নিয়ে কেনো যাবে না! তো বহোত দূর তো। দো টাকা লাগবে।'

'আহা আহা, সে তো লাগবেই—' লঙ্কার ইশারায় মরিচ তাড়াতাড়ি প্যান্টের পকেট থেকে একটা দু টাকার নোট বার করে দেয়।...দু'জনে চড়ে বসে। লঙ্কার বেদম কাসি, মুখ থেকে রুমাল নামাতেই পারছে না।

তাতে কী? অগ্রিম টাকা লাভে হৃষ্ট শুকদেব মহোৎসাহে সারাক্ষণ নতুন শ্রোতাকে বক্তৃতা শুনিয়ে যায়।

'এখন তালুকদারবাবু বহোত বড়া বিজিনেসম্যান, দিল্লি, বোম্বাই কলকত্তা বনারস, সব জায়গায় বিজিনেস। রোজ রোজ ভি পিলেনে চেপে আকাশে উড়ে উড়ে কাজ দেখতে যাচ্ছে।...বহোত মহাজনলোক, গণেশ মহল্লায় ভি একটা ডেরা আছে। গরিব-উরিব ছেলেরা ভোজন পায়, আবার থাকতে ভি পায়!'

তবে কোঠিমে পৌঁছে ওই মহান ব্যক্তিটির দেখা মিলল না। চেকলুঙ্গিরও না, চোঙাপ্যান্টেরও না।

'সব লোগ বাহার গিয়া। আভি যাও।'

বলে দরোয়ান ভাগিয়ে দিল।

দিল বটে, কিন্তু মাসতুতো ভাইয়ের যে ভারী দরকার সেই লোকদুটোকে!... তো গণেশ মহল্লায় যেতে যদি দশটাকা লাগে, লাগবে।

॥ ১২ ॥

হিরের আংটি অবশ্য গাড়ি বার করলেন, তবে ওই বুদ্ধুদুটোর কথায় স্বচক্ষে দর্শন করতে গোধুলিয়ার মোড়ে গেলেন না,

প্রেমেন্দ্র মিত্র
এবং
ঘনাদার গল্প

প্রেমেন্দ্র মিত্র ঘনাদার গল্প শুনিয়েই অবিস্মরণীয় হয়ে থাকতে পারতেন। বল্গাহীন কৌতুক-কল্পনার রাজা ঘনাদা, সমগ্র বাংলা সাহিত্যেই তাঁর জুড়ি নেই। ঘনাদা ও তাঁর মেসবাড়ির বাসিন্দাদের নিয়ে গল্পগুলি যেমন নিত্যনতুন, তেমনি পুরনো গল্পও চিরনতুন। এখন আবার প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস' নামের এমন বই বেরিয়েছে, যেখানে ঘনাদার পূর্বপুরুষদের নানান ঐতিহাসিক কীর্তিকলাপের কাহিনী জায়গা পেয়েছে। এ-বইতেও আরেক ধরনের মজা আর কৌতুক। তবে ঘনাদার গল্প যিনি শোনান সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র বাংলা সাহিত্যেরও যে বিরাট মাপের এক কবি, সে-কথা ভুললে চলবে কেন ? তাই তাঁর 'ছড়া যায় ছড়িয়ে'ও প্রত্যেকের পড়ে- ফেলা চাই।

প্রেমেন্দ্র মিত্রের বই

যাঁর নাম ঘনাদা ৭·০০
ঘনাদার ফুঁ ৮·০০
তেল দেবেন ঘনাদা ৬·০০
ঘনাদা তস্য তস্য অমনিবাস ৩৫·০০
ছড়া যায় ছড়িয়ে ৫·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯ ফোন ৩৪ ৪৩৬২

গেলেন মতিলালের আড্ডাতেই।

'বাবু, আবার এক্ষুনি ?' মতিলাল চমকে ওঠে।

'এলাম! এই যে এরা এসে গেছে। ছোঁড়াটাকে আন।'

মতিলাল মাথা চুলকে বলল, 'আজ্ঞে, আনা যাবে না।'

'তার মানে ? ভেগে গেছে নাকি ? ব্যাটা, তুমি ছিলে কোথায় ?'

'আজ্ঞে, আমি এখানেই ছিলাম। তবু ছোঁড়াটা—ঠিক বুঝতে পারছি না। পৃথিবী থেকেই ভেগে গেল কিনা। একটু ধোলাই দিয়েছি কি ব্যাটা লটকে পড়ে—'

'ব্যাটা, পাজি শুয়ার। তোরা সবাই মিলে আমায় ফাঁসাতে চাস। এমন ধোলাই দিলি যে—পৃথিবী ছেড়ে ভেগে গেল ?'

'আজ্ঞে বেশি কিছুই দিই নাই। আপনার হুকুমেই—'

'রাস্কেল শয়তান! আমি তো চামড়া ছাড়িয়ে নিতে হুকুম দিয়েছি, নিবি তাই ?...কই দেখি গে!'

দেখে বাঘা তালুকদারেরও বুক ধকধক করে উঠল। ফিনিশই হয়ে গেছে মনে হচ্ছে। গরম দুধ খাওয়াবার চেষ্টা হল, মুখের পাশ দিয়ে গড়িয়ে পড়ে গেল।...অথচ ডাক্তার ডাকার উপায় নেই।

এখন উপায় ? রাতের আগে তো লাশ পাচার করা যাবে না। হিরের আংটি পরা হাতে মতিলালেরই গলা টিপতে আসেন মহান তালুকদারবাবু। 'আয় বেটা, তোকেও ফিনিশ করে দুটো লাশই গঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসি।'

শেষপর্যন্ত অবশ্য টিপলেন না। তাঁর হচ্ছে ঠাণ্ডা মাথা!...

কড়া হুকুম দিলেন, যেন ঘটনাটা মহল্লার কেউ টের না পায়।...কিন্তু মালটা উদ্ধারের আশা তাহলে গেল ? ছোঁড়ার মুখটা তো চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে গেল।

চোঙাপ্যান্ট ভয়ে ভয়ে বলল, 'এখন ভরসা সেই কেলে শুঁটকো ছেলেটা। বাক্সটা তো তার কাছেই আছে মনে হচ্ছে!'

॥ ১৩ ॥

গলির পর গলি ডাইনে বাঁয়ে, বাঁয়ে ডাইনে, সরু থেকে আরো সরু, রিকশ বাঁক নিচ্ছে তো নিচ্ছে। শুকদেব ছেলেটা নেহাত ডঙ্কার চেনা, তাই প্রাণে সাহস আছে, নাহলে মনে হত ছেলেটা বোধহয় তাদেরও কোনো ভয়ানক জায়গায় নিয়ে গিয়ে গুম খুন করে ফেলবে।

গলির দুপাশে ভীষণ পুরনো পুরনো উঁচু উঁচু বাড়ি। তার ছায়ায় দিনেও অন্ধকার। আর বাড়িগুলোর দরজার সামনে সামনে রাজ্যির জঞ্জালের স্তূপ।...এখন আর লঙ্কাকে মুখে রুমাল দিয়ে কাসতে হয় না, কাতর গলায় বলে, 'শুকদেব, এ কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? রাস্তা ভুল করছ না তো।'

'হি হি হি। শুকদেব বানারসের রাস্তা ভুল করবে ?'

'এত ভীষণ গলি কেন ?'

'কেনো ? ওটা মা অন্নপূর্ণা, আর বিশ্‌নাথজি জানে।'

'তোমার তালুকদারবাবুর বড়া মোটরগাড়ি এর মধ্যে ঢোকে কী করে ?'

'হা হা হা! দাদাবাবু কী বোলছে! সে গাড়ি তো হুই বড়া রাস্তামে খাড়া থাকে। তো তালুকদারবাবুকো নিজের ভি রিকশা আছে।...দো-তিন রিকশা।'

'তো এত গলির মধ্যে ওঁর কী কাজ কাম ?'

শুকদেব দু'হাত চওড়া গলির মধ্যে ডাস্টবিন ওলটানো জঞ্জাল মাড়িয়ে সাবধানে বাঁক নিতে নিতে গড়গড়িয়ে যা বলে চলে, তার সংক্ষিপ্তসার হচ্ছে, গরিব দুঃখী কানা-খোঁড়া ভিখিরি কাঙালদের ছেলেদের কি বাবু 'হোটেল প্যারাডাইসে'

রাখতে যাবে ? এখানে মতিলাল চুনিলাল দুই ভাইয়ের 'পাইস হোটেল' আছে। সেখানে রাখে তাদের।

মরিচও নাকে রুমাল চাপে দুর্গন্ধের জ্বালায়। বলে, 'লঙ্কা, বুঝতে পারছিস ? লোকটার ভিখিরি তৈরির বিজনেসও আছে।...বাবা বলে, অনেক বড় লোক এমন করে।' তারপর শুকদেবকে বলে, 'ওই ছেলেগুলো কী করে ?'

'আরে বাবা, কানা অন্ধা নুলো ল্যাংড়ারা আবার কী করবে ? মাঝে মাঝে রেলগাড়ি ভর্তি করে ভিন গাঁয়ে পাঠিয়ে দেয় হাসপাতালে ডাগদারভি দেখাতে, দাওয়াই ভি দিতে। বহোত মহান মানব হচ্ছে তালুকদারবাবু।.. ওই ল্যাংড়া অন্ধদের দেখ্‌ভাল করতে এই নোংরা গলির মধ্যে হরদম আসছে যাচ্ছে।'

লঙ্কা বলল, 'তুই বুঝি নিয়ে আসিস ?'

সে তো এখন 'ডঙ্কা', তাই তুই বলাই সঙ্গত মনে করে।

শুকদেব বলে, 'আমি কেনো ? তালুকদারবাবুকো তো দো-তিন রিকশা রয়েছে। তো একটা রিকশ আমার চাচার। চাচা সব বলে। এই যে...ওই সামনের কোঠিটা চুনিলালের হোটেল !'

হো টে ল ! দেখে মাথা ঘুরে যায় এদের। মনে হচ্ছে পাঁচশো বছরের পুরনো ঘাড়-গোঁজা পাঁজর-ভাঙা একটা কেল্লা বা প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ !... ডঙ্কাকে নিয়ে এসে এখানেই পুরে রাখেনি তো ?

বুক কাঁপতে থাকে লঙ্কার।

ডঙ্কা তার সঙ্গে খুনসুড়ি করে বটে, কিন্তু ডঙ্কা কি তার কম প্রাণের ?

'যান দাদাবাবু, নেমে যান। ওই তো ওদিকে যাবার রিকশটা বসে আছে। এখানেই আছে আপনার মাসিতো ভাইয়ের চিনা-উনারা।.. ঢুকে যান, কেওয়াড়ি তো খুলাই হ্যায়।'

মরিচ আস্তে বলল, 'ভয়ে তো প্রাণ উড়ে যাচ্ছে রে। পরে গজা-ফজাকে সঙ্গে করে নিয়ে এলে হত না ?'

লঙ্কা বলল, 'এসেছি যখন দেখেই যাব।'

নামল আস্তে আস্তে।

শুকদেব বলল, 'আমায় এখানে দেখলে চাচা বকবে। আসতে না করে। আমি ওই ও দিকের ভাঙা পাঁচিল ধারে ঢুকে যাচ্ছি।'

ঝপ্‌ করে একটা আড়ালে ঢুকে গেল শুকদেব।

লঙ্কা আর মরিচ প্রাণ হাতে করেই কাঁপা কাঁপা পায়ে সেই খোলা কেওয়াড়ির মধ্যে পা দিয়েই চমকে উঠল একটা বাঘের মতো চাপা গর্জনে, 'ওঃ! ভরসা সেই কেলে শুঁটকোটা ? তার কাছেই মালটা আছে ? আন না তাকে ! এই ব্যাটা ইয়াসিন আর নন্দকে ডালকুত্তা দিয়ে খাওয়াতে পারলেও রাগ যায় না।'

ইয়াসিন। সেই ইয়াসিন।

আর কোনো সন্দেহ নেই। এরাই নাটের গুরু।

কিন্তু যদি হঠাৎ বেরিয়ে আসে ! ওরে বাবা !

পড়ি তো মরি করে ছুটে এসে সেই পাঁচিলটার আড়ালে শুকদেবের কাছে গিয়ে হুমড়ে পড়ল দুজনে।

শুকদেব দাঁত বার করে ইশারায় বলল, 'কী হল ?'

'বহুত গন্ধা ! চল চল বাবা ! উঃ ! নে তোর টাকা ! তাড়াতাড়ি চল।'

দশটা টাকা দিয়ে দিল তার হাতে, চটপট। হৃষ্ট শুকদেব টপাস করে রিকশ ধরল, এরা উঠে পড়ল চটপট !

আর ? চলে আসার পথে পিছনে আবার সেই বাঘা গলা—'এদিকে ছোঁড়া টেঁশে বসে আছে কিনা ঠিক নেই আর ওঁরা তাকে এই মাত্তর গোধুলিয়ায় দেখে এলেন।..ডালকুত্তা ! ডালকুত্তাই হচ্ছে

তোদের ওষুধ !'

'লঙ্কা !'
'বল !'
'টেঁশে যাবার কথা কী বলল ?'
'জানি না। ভাবতে দে আমায়। নির্ঘাত এইখানেই ডঙ্কাকে এনে—ওঃ! কেন মরতে আমরা বেনারসে এসেছিলাম রে।...ওই তালুকদার না কে, ওটাই নির্ঘাত দলের সর্দার।...ইয়াসিনদের দিয়ে মাল পাচার করায় আর—মরিচ—'
হঠাৎ কেঁদে ফেলে লঙ্কা।'ওই বাঘমুখো সুটকেসটার জন্যেই রে মরিচ। আমাকে ভেবে ডঙ্কাকে ধরে এনে—ওরে বাবা রে !'
'কী হল দাদাবাবু! বেশি বেমার লাগছে ?'
শুকদেবের প্রশ্নে মরিচ বলল, 'হুঁ, তুমি এক্ষুনি চলে যেও না। ডাগদারখানায় যেতে ভি হতে পারে।'
দশটার জায়গায় কুড়িটা টাকা দিয়ে দিল। ঢুকে এল বাড়ির মধ্যে, গজাননকে সঙ্গে নেবে বলে, এসে দেখে বাড়ির পরিস্থিতি অদ্ভুত !

তা হবে না অদ্ভুত ! কেঁদে কেঁদে আর না খেয়ে খেয়ে স্পঞ্জ রসগোল্লা বাসি জিলিপি হয়ে গেলেও, ভেতরের তেজ যাবে কোথায় ? তিনি কি ওই পুঁচকে দুটো ছেলের কথায় ভরসা করে বসে থাকবেন ? তিনি ইত্যবসরে পাড়ার লোককে দিয়ে ট্রাঙ্ককল করিয়ে মরিচের বাবাকে চটপট চলে আসতে নির্দেশ দিয়েছেন, আর গজাননকে দিয়ে থানায় খবর দিয়ে পুলিশ আনিয়েছেন। মরিচের বাবা হলেও কলকাতার একটা বাঘা পুলিশ অফিসার তো বটে। আইন-কানুন তো জানেন।..
লঙ্কা মরিচ বলেছে কিডন্যাপ করার মানে ছেলের বদলে গাদা গাদা টাকা চাওয়া। পিসি বলেছে, তা তাই বা এসে চাইছে কই ? আসুক না। টাকার পুঁটুলিটি ধরে দিয়ে, ছেলেকে ঘরে পুরে নিয়ে ক্যাঁক করে বেটার হাতে হাতকড়া পরিয়ে দেব, ব্যাস !...পুলিশের সঙ্গে সেই কথাই হচ্ছে।
লঙ্কারা তো ঢুকেই দেখল, দালানে গজানন, এবং দুজন কনস্টেবল !..বসার ঘরে সোফায় দেবলারানী আর তাঁর এক জাঁদরেল চেহারার বান্ধবী।.. আর বড় চেয়ারে রোগা টিঙটিঙে এক পুলিশ অফিসার।
তাঁর পোশাকটাই যা জাঁদরেল।
তাঁর কোলের ওপর একটা ফোটো অ্যালবাম উল্টে উল্টে দেখছেন।
এক নজরেই বুঝল লঙ্কা, ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠা ডঙ্কার নানান বয়েসের ছবি। নানা ভঙ্গির।..পিসির সঙ্গে, বন্ধুদের সঙ্গে, একা সাইকেল হাতে, গাড়ির সামনে।
এর সবই লঙ্কাদের বাড়িতেও আছে।
ফোটো তোলানোর ভারী শখ পিসির, আর যখনি তোলায়, এক কপি করে পাঠিয়ে দেয় কলকাতায় লঙ্কার কাছে।

ওঃ, বাইরে যে কালো গাড়িটা দেখে এল এরা, সেটা তাহলে এই পুলিশসাহেবের। তার মানে পিসি ধৈর্য ধরে থাকতে পারেনি।
ভাগ্যিস পারেনি।..ভগবানেরই দয়া। নইলে এক্ষুনি লঙ্কা পুলিশ পেত কোথায় ?
লঙ্কারা ঢুকতেই পুলিশসাহেব মলয় বসাক চিৎকার করে ওঠেন, 'বাঃ বাঃ ! বেড়ে ! ছেলে দিব্যি বন্ধুর সঙ্গে বেড়িয়ে এল, আর আপনি ছেলে চুরি গেছে বলে হৈচৈ করছেন ?...ক'দিন কোথায় ছিলে জাদু ? খুব লায়েক হয়েছ মনে হচ্ছে ? কোথায় গিয়েছিলে না বলে-কয়ে ?'
লঙ্কা এক নজরে ডঙ্কার একটা সম্প্রতিকার ফোটোর দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলে, 'কোথাও যাইনি, এই ঘণ্টা

কয়েক আগেই ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়েছি। এখনো বোধহয় সেই সব ডিশ-ফিশ পড়ে আছে।'

'তার মানে ?' মলয় বসাক টেবিল চাপড়ে দাঁড়িয়ে ওঠেন, 'তবে ছেলে চুরি গেছে বলে আমায় অকারণ হ্যারাস করা হল কেন ?'

'অকারণ নয় সকারণই। ছেলে একটা সত্যি হারিয়েছে। এবং সে আমার ভাই।'

'ওঃ, বটে ! তাহলে আমায় তোমার ফোটো দেখানো হচ্ছে কেন ?'

'আমার নয়, তারই।'

'বটে ! আমার সঙ্গে ঠাট্টা ? কী রকম ভাই তোমার ?'

'ভাই ঠিক যে-রকম হয় সেই রকম ! এক মা বাবার মানে যাকে বলে সহোদর।'

মলয় কড়া চোখে দেবলারানীর দিকে তাকিয়ে বলেন, 'এ যা বলছে সত্যি ?'

দেবলাও কড়া গলায় বলেন, 'সত্যি ছাড়া মিথ্যে বলতে যাবে কেন ?'

'ওঃ। তোমার বড় ভাই ?'

'না।'

'ছোট ভাই ?'

'উঁহু।'

'বড়ও নয় ছোটও নয়, অথচ সহোদর। এ কি মামদোবাজি নাকি ? দ্যাখো ছোকরা, তোমার এই বেয়াদপির জন্যেই আমি তোমায় অ্যারেস্ট করতে পারি জানো ?'

লঙ্কা আরো গম্ভীর হয়ে বলে, 'সে তো আপনারা অকারণেও পারেন। কিন্তু টুইন কথাটা কি আপনি কখনো শোনেননি ? মানে যমজ ?'

'অ্যাঁ।' মলয় বসাক আবার বসে পড়ে বলেন, 'এতক্ষণ সেটা বলা হয়নি কেন ?'

পিসি মদগর্বভাবে বলেন, 'বলবার সময় দিলেন কখন বাবা ? ছেলেটা ঘরে ঢুকল কি আপনি তাকে এই মার তো সেই মার। ওই যমজ ছেলে রেখে মা অকালে মারা গেল, তাদের একটি এই কাশীতে পিসির কাছে মানুষ হচ্ছে, আর এইটি কলকাতায় মামার কাছে। তো গরমের ছুটিতে বেড়াতে এল বাছা, কোথায় দুই ভাই খেলবে বেড়াবে, তা নয়, সঙ্গে সঙ্গে কিনা একটাকে দুশমনে নিয়ে গেল।' পিসি হু-হু করে কেঁদে উঠল, চোখে আঁচল দিয়ে বলল, 'কী অলুক্ষুনে বাক্সই আনলি বাবা !'

'বাক্স ?' মলয় চমকে ওঠেন, 'বাক্স কিসের ?'

লঙ্কা পিসির বোকামিতে একটু বিরক্ত হয়ে বলে ওঠে, 'সেটা এমন কিছু ব্যাপার নয়, পরে শুনলেও চলবে, এখন চলুন আমার সঙ্গে এক জায়গায়, একটা সন্ধান পাওয়া গেছে মনে হচ্ছে।'

'মনে হচ্ছে ! কার মনে হচ্ছে ?'

'আজ্ঞে আমারই ! খুঁজছি তো কদিন ধরে। দয়া করে চলুন একবার। দেরি করলে হয়তো—'

'ঠিক আছে। কিন্তু বাক্সটা ?'

'সেটা এসে শুনবেন স্যার। দেরি করলে কী হয় বলা যায় না। দোহাই আপনার। পাখি উড়ে যেতে পারে।'

লঙ্কার আকুলতায় মলয় রাজি হলেন। তাঁর জিপ গাড়িতেই ইনসপেক্টর দু'জন এবং লঙ্কা মরিচ।

॥ ১৪ ॥

তা লঙ্কার কথা প্রায় সত্যিই হচ্ছিল। পাখি উড়ছিল !

হিরের আংটির নির্দেশে মতিলাল একটা চটের থলে যোগাড় করে এনে 'পাজি বদমাশ শয়তান ছোঁড়াটার' লাশটা ভরবার তোড়জোড় করছিল, সেই সময় গণেশ মহল্লায় মতিলালের ডেরার কাছে পুলিশের গাড়ি।..মসমস জুতোর শব্দ। গলির মুখে রাইফেল হাতে কনস্টেবল।..কিন্তু এ কী

দৃশ্য ! অ্যাঁ ! মলয় বসাকের বসে পড়ার যোগাড় ।

আর ডঙ্কার লাশ দেখে লঙ্কা, 'ওরে ডঙ্কা তোকে এই করেছে—' বলে বুকফাটা চিৎকার করে ওঠে ।

আর ?

আর সঙ্গে সঙ্গে হাত-পা ল্যাতানো ঘাড় লটকানো ডঙ্কা, প্রায় তড়াক করে লাফিয়ে উঠে লঙ্কাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে ওঠে, 'ওরে লঙ্কা রে,আর তোকে পাঞ্জাতে হারাতে পারব না । মড়ার পার্ট প্লে করতে করতে প্রায় মরতেই বসেছি । আর একটু পরে এলেই এরা আমায় বস্তায় পুরে ফেলত । তবে গঙ্গায় ফেলে দেবে শুনে আশা ছিল বস্তার মধ্যে থেকেই সাঁতরে গঙ্গার ওপারে চলে যেতে পারব ।'

তারপর ?

তারপর যা ঘটল সে তো যেখানে যত খবরের কাগজে হৈহৈ করে বেরোল ছবি-টবি দিয়ে । ফলাও করে বেরোল, কী করে দুটো খুদে ছেলের বুদ্ধিতে আর সাহসে জালে ধরা পড়ে গেল, রাঘব বোয়াল নয়, বিশাল একটা কুমির !

সেই কুমির । যে নাকি কখনো তালুকদার, কখনো মুলুকরাজ, কখনো সরকার, কখনো সর্দার । কখনো গম্বু সিং, কখনো লিওপিং ।

শুধু এই ভারতভূমিতেই নয়, ভারতের বাইরেও বহু জায়গায় তাঁর বিজনেস ।...বহুমুখী প্রতিভা, বহুমুখী শাখা । পুলিশ তার কার্যকলাপ জানে কিন্তু ধরতে পারে না ।

হাতকড়া লাগাবার সময় লোকটা লঙ্কা মরিচের দিকে ভস্মকরা দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে গেল, 'এ-যাবৎ ভূত থেকে ভগবান পর্যন্ত সবাইকে ঘুষ দিয়ে দিয়ে পার হয়ে এলাম, আর তোদের মতো দুটো পুঁচকে ছোঁড়ার কাছে ডুবলাম ?..আচ্ছা, দেখা যাবে ।'

তালুকদার না হয় ফাঁসির পরে ভূত হয়েও এদের দেখতে পারে, কিন্তু মলয় বসাক যে তদ্দণ্ডেই সেই 'বাক্সটা' না দেখে থাকতে পারছে না । কী আছে তার মধ্যে ?

কী ছিল ?

ছিল ঠাস-বুননিতে ঠাসা বেশ কয়েক লক্ষ টাকার একশো টাকার নোটের বাণ্ডিল ।

সম্প্রতিকার কলকাতার কোনো ব্যাঙ্ক ডাকাতির অবদান ।..মলয় বসাক তুলে নিয়ে গেল সেটা তার গাড়িতে ।

মরুকগে, সে টাকা মলয় বসাক নিয়ে গিয়ে যা করবার করুকগে, যে টাকা দেখলে গায়ে কাঁটা দেয়, 'সিয়ারাম সিয়ারাম' করে ডিগবাজি খেতে হয়, সে আবার একটা জিনিস নাকি ? বাড়ি থেকে বিদেয় হয়েছে, না দেবলারানীর হাড়ে বাতাস লেগেছে ।

তবে ওই সূত্রে তাঁর বাবার বাড়িতে যে এত বড় একখানা গুলজার হচ্ছে, সেটাই মস্ত লাভ ।..গাছের আম আর মুখপোড়া হনুমানদের ভোগের জন্যে একটাও রইল না । গজানন পেড়ে আনছে আর ছাড়াচ্ছে, আর পিসি প্লেটে প্লেটে সাজিয়ে ধরে দিচ্ছে লঙ্কাকে ডঙ্কাকে । লঙ্কা-ডঙ্কার মামাকে মাসিকে, মরিচকে আর তার মা-বাপকে । সব্বাই যে এসে হাজির ।

লঙ্কার মাসি আম খেতে খেতে আর উল বুনতে বুনতে বলল, 'এর পরে আর বলতে পারবে কেউ মামা-মাসিতে মিলে লঙ্কাকে নাবালক করে রেখে দিয়েছে ? পাহাড়চুড়োয় ওঠার থেকে—কুমির ধরা কিছু কম ?

পিসি আম গোছাতে গোছাতে বলে, 'পাগল.! কে বলেছে কম ? তবে বাপু বলি, দশ-বিশ ঘণ্টা ধরে মড়ার পার্ট প্লে করে কুমিরকে ফাঁকি দেওয়াও কিছু কম নয় ।'

ছবি অহিভূষণ মালিক

ধাঁধা

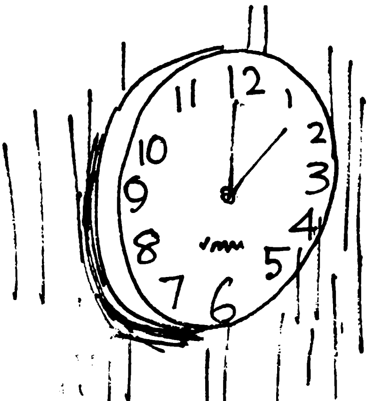

"একটা বারোটা-বাজা ঘড়ির বারোটা বাজা নিয়ে এবারের ধাঁধা।" ছোট্‌কা বলল।

কথাটা শুনতে যত মজার, বুঝতে ততটা নয়। অন্তত আমার কাছে সেই মুহূর্তে মানেটা স্পষ্ট হল না। তবে একটা জিনিস স্পষ্ট বুঝতে পারছিলাম যে, নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই কথাটা বলা। ছোট্‌কার অ্যালার্ম-ঘড়িটা কদিন ধরে সমানে ভোগাচ্ছে, ছোট্‌কা রোজই একবার সকালে চায়ের টেবিলে বসে ঘড়িটার কথা বলে। রোজই নাকি স্লো যাচ্ছে ঘড়িটা। দু-তিনবার সারিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তবে কতটা স্লো হয়ে যাচ্ছে, আর সেই সময়ের হেরফের নিয়ে কী ধাঁধা ভেবেছে ছোট্‌কা সেটা জানি না। আজ সকালে যখন ধাঁধা চাইতে এলাম, ছোট্‌কা তখন টেবিলের অ্যালার্ম-ঘড়িটায় চাবি ঘোরাচ্ছিল। আমাকে দেখেই কথাটা বলল, 'একটা বারোটা-বাজা ঘড়ির বারোটা বাজা নিয়ে এবারের ধাঁধা।'

আমাকে বসিয়ে নিজের হাতঘড়িটাতেও দম দিয়ে নিল ছোট্‌কা। তারপর পুরো ধাঁধাটা বলল।

সেইটে দিয়েই এবার শুরু করছি।

প্রথম ধাঁধা ।। একটা অ্যালার্ম-ঘড়ি খারাপ হয়ে গেছে। খারাপ মানে, স্লো হয়ে যায়। তা, হিসেব করে দেখা গেছে যে, ঘণ্টায় ঠিক চার মিনিট করে স্লো যায় ঘড়িটা।

ধরা যাক, অ্যালার্ম-ঘড়িটাকে সাড়ে তিন ঘণ্টা আগে সময় মিলিয়ে ঠিক করে রাখা হয়েছিল।

এখন, আরেকটা ঘড়িতে, যেটা ঠিকঠিক সময় দেয়, দেখা গেল দুপুর বারোটা বাজল।

অ্যালার্ম-ঘড়িটাতে তাহলে কত মিনিট পরে বারোটা বাজবে? খুব সূক্ষ্ম হিসেব করার দরকার নেই। মোটামুটিভাবে বললেই চলবে কত মিনিট লাগবে?

দ্বিতীয় ধাঁধা। পাশাপাশি দুটো ছক দেওয়া হল। প্রথমটা মন দিয়ে দেখে দ্বিতীয়টার ফাঁকা জায়গায় উপযুক্ত সংখ্যা বসাতে হবে। খুবই সোজা কাজ, শুধু মন দিয়ে দেখা—

২	৬
৫৪	১৮

?	৯
৮১	২৭

তৃতীয় ধাঁধা ।। জট ছাড়াও—কা র দো দা ন

গতবারের উত্তর ।। (১) অরুণ ২৮, বরুণ ২১। (২) ইলেকট্রিক ট্রেনের ধোঁয়া আবার কী? (৩) করমর্দন।

সত্যসন্ধ

শব্দ-সন্ধান

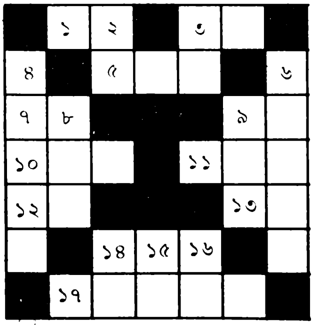

সংকেত : পাশাপাশি : (১) গল্পের শেয়াল যে-ফলের নাগাল পায়নি। (৩) বৃত্তকে সম-দ্বিখণ্ডিত করে। (৫) রান্নাবান্না। (৭) প্রতারক। (৯) একই শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করো : বিতর্কিত — নিয়ে খেলার মাঠে — বাধল। (১০) ছোটদের খেলনাবিশেষ। (১১) পণ্যদ্রব্য। (১২) ঝাঁজালো শস্য। (১৩) আপন নয়। (১৪) স্নেহ।(১৭) জাদুকর।

উপর-নীচ : (২) সোডা-জাতীয়। (৩) পঞ্চবায়ুর অন্যতম। (৪) বৃক্ষচর ক্ষুদ্র প্রাণী। (৬) মিষ্টি বাজনা। (৮) নৌকোয় থাকে। (৯) গোরু ও সাপ মিলিয়ে যে-প্রাণী। (১৪) গম্ভীর ধ্বনি।(১৫) আমোদ।(১৬) এক হাতে বাজে না।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

ঘ	টো	ৎ	ক	চ
ট	ল		দ্রু	ম
ক				ৎ
র্প	শৃ		রু	কা
র	ক	ম	ফে	র

মজার খেলা

সেই যে ষোলটা দেশলাইকাঠি দিয়ে মাছের কাঁটার মতো সাজিয়ে একটা খেলা আগে শিখেছি, এবারে শিখব তারই একটা রকমফের। প্রথমে নীচের ছবির মতো করে দেশলাইকাঠিগুলোকে টেবিলে সাজিয়ে ফেলো।

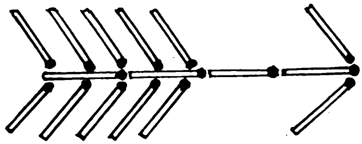

সাজিয়েছ ? বেশ, এবার কোনো বন্ধুকে ডাকো। তাকে বলো ওপরের এই কাঠিগুলো থেকে সাতটা কাঠি তুলে এদিক-ওদিক করে এমনভাবে আবার রাখতে হবে, যাতে টেবিলে সমান মাপের পাঁচটা চতুর্ভুজ তৈরি হয়। এর আগে যা আমরা শিখেছিলাম, তা হল, আটটা কাঠি সাজিয়ে আটটা ত্রিভুজ তৈরি করা।

এবার তোমার নিজের শেখার পালা। চেষ্টা করো। না পারলে, নীচের ছবিতে দ্যাখো। যে-সাতটা কাঠি তুলতে হবে তা '×' চিহ্ন দিয়ে দেখানো হয়েছে—

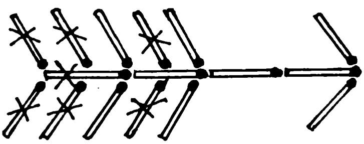

আর সেই সাতটা কাঠি কীভাবে বসছে তা বুঝতে পারবে নীচের ছবিটা দেখলেই—

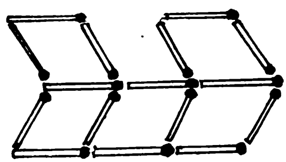

মজারু

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল চন্দ্রগ্রহণের ফোটো

ফোটো : তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ যে মা'র চারটি বাচ্চা তাকে কী বলা যায় ?
উঃ চৌবাচ্চা ।

প্রঃ মানুষ কি কোনো অবস্থায় ফলে পরিণত হতে পারে ?
উঃ একাধিক পারে । মানুষ যখন কোথাও যায়, তখন হয় **Mangoes.**

সুসেন

হাসিখুশি

"আমাকে দুটো কাটলেট দাও ।"
"স্যার, আর কিছু দেব কি ?"
"কাটলেটগুলো যদি আগের মতো হয়, তাহলে একটা হাতুড়ি দিও !"

●

"তোমাকে যে কী বলে সান্ত্বনা দেব, ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না ।"
"যদি কিছু মনে না করো, তাহলে আমার অভিধানটা তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ধার দিতে পারি ।"

"আমার ভাগ্য ভাল আমি জার্মানিতে জন্মাইনি !"
"ও কথা বলছ কেন ?"
"আমি যে জার্মান ভাষা জানি না !"

"এই যন্ত্র আপনার কাজ অর্ধেক করে দেবে ।"
"তাহলে তো আমাকে দুটো কিনতে হবে ।"

●

"মা, রান্নাঘরে একটা সাদা বেড়াল ঢুকেছে ।"
"ঢুকুক । সাদা বেড়াল খুব পয়মন্ত ।"
"কিন্তু সে যে সব দুধ আর মাছ খেয়ে নিচ্ছে !"

ছবি : অহিভূষণ মালিক

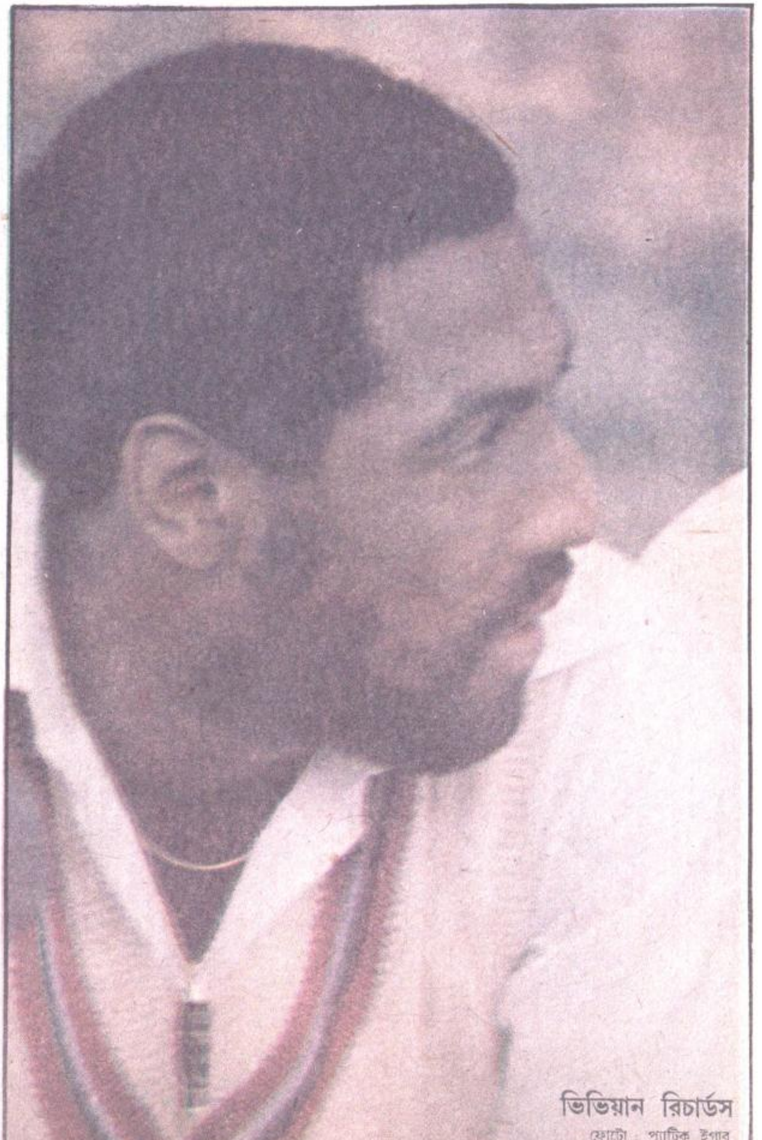

ভিভিয়ান রিচার্ডস

ফোটো : প্যাট্রিক ইগার

(পাতা ওলটালেই ক্রিকেটের খবর)

ব্যাট-দানব

অশোক রায়

খেলা খুব ঝিমিয়ে পড়েছে ? বিপক্ষ বোলার হঠাৎই ব্যাটসম্যানদের কোণঠাসা করছে ? ঝটপট কিছু রান চাই ? চিন্তার কিচ্ছু নেই। ব্যাট হাতে আসছেন মুশকিল আসান। পৃথিবীর যে কোনো ক্রিকেট-মাঠকে মুহূর্তে সজাগ করে তোলার মন্ত্র-জানা এই ক্রিকেটারটির নাম—আইজ্যাক ভিভিয়ান আলেকজাণ্ডার রিচার্ডস। ব্যাট হাতে যিনি বোলারের দুঃস্বপ্ন। কপিলদেব অ্যাণ্ড কোম্পানিকে এবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজে মুখোমুখি হতে হচ্ছে এই ব্যাট-দানবের।

সত্যিই দানব। কালো কুচকুচে পাথরে গড়া বিরাট মাপের শরীর। অথচ পা দুটো দারুণ হালকা। পৃথিবীর যে-কোনো ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে খেলার সময়ও নিখুঁত পজিশনে চলে যায়। রিচার্ডসের দৃষ্টিশক্তি যেমন, তেমনি রিফ্লেক্স, তেমনি চমৎকার সেন্স অব টাইমিং।

ক্রিকেট খেলার প্রতি রিচার্ডসের আকর্ষণ ছোটবেলা থেকেই। নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকত না। খাবার সময় ভিভকে কাছে-পিঠে না পেয়ে মা অবশেষে একটা উপায় বার করলেন। ভিভের খেলার ট্রাউজার্সটি লুকিয়ে রাখলেন। ভিভের খেলার ট্রাউজার্স বলতে একটাই। কিন্তু সামান্য ট্রাউজার্সের কারণে একটা ম্যাচ ছেড়ে দিয়ে বাড়িতে তো আটকে থাকা সম্ভব নয়, অন্তত ভিভের কাছে। বন্ধুরা এগিয়ে আসায় মা'র ফন্দিটা আর ঠিকমতো কাজে লাগল না। খেলা যথারীতি চলতে লাগল।

খেলতে খেলতেই লোকাল 'হিরো' বনে গেলেন রিচার্ডস। এই হিরোকে নিয়েই দারুণ দাঙ্গা বেধেছিল একদিন। সেন্ট কিট্‌সের বিপক্ষে আন্টিগুয়ার পক্ষে ব্যাট করতে এলেন রিচার্ডস। এবং 'শূন্য' কাটাবার আগেই ব্যাট-প্যাড ক্যাচের আবেদন উঠল তাঁর বিপক্ষে। দর্শক এবং রিচার্ডসকে অবাক করেই আম্পায়ার আঙুল তুললেন। কিন্তু আম্পায়ার আঙুল তুললে কী হবে, ক্ষুব্ধ রিচার্ডস কিছুতেই উইকেট ছেড়ে নড়বেন না। ঘটনাটি মুহূর্তে দর্শকদের মধ্যে দেশলাই জ্বেলে দিল। আম্পায়ারকে বেশ কিছু তীক্ষ্ণ, তীব্র মন্তব্য শুনিয়ে রিচার্ডস যখন মাঠ ছাড়লেন দর্শকদের মধ্যে তখন চলছে বিরাট দাঙ্গা। শেষ পর্যন্ত দর্শকদের চাপে রিচার্ডসকে আবার ব্যাট করার সুযোগ দেওয়া হল। দাঙ্গার কারণে রিচার্ডসের মন-মেজাজ ঠিক ছিল না। ব্যাট করতে এসে তিনি আবার আউট হলেন শূন্য রানে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, দ্বিতীয় ইনিংসেও এই লোকাল হিরোর সংগ্রহে জমা পড়ল আরেকটি শূন্য ! এখনও হাসতে হাসতে রিচার্ডস বলেন, "একই ম্যাচে তিনবার শূন্য করার ওয়ার্ল্ড রেকর্ড আর কারও আছে ?"

এখন পুরনো ঘটনায় রিচার্ডস হয়তো হাসেন, মজা পান। কিন্তু সেদিন ওই ঘটনার পরে রিচার্ডসকে দু-বছরের জন্যে সাসপেণ্ড করা হয়। ওইটাই ছিল রিচার্ডসের ক্রিকেট জীবনের টার্নিং পয়েন্ট। এর পরে তিনি আবার ক্রিকেটে ফিরলেন। এবং ফিরলেন একটা জেদ নিয়ে। বিপক্ষ বোলিংকে ধ্বংস করার জেদ। সেদিনের সেই জেদই আজ রিচার্ডসকে পৌঁছে দিয়েছে বিশ্বের এক নম্বর জায়গায়।

নাটকীয় জয়

মণীশ মৌলিক

পঞ্চম দিনে খেলা শুরু হওয়ার আগে, ভারতীয় ব্যাটিংয়ের ধাঁচধরন দেখে মনে হয়েছিল, স্যাবাইনা পার্কে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ভারতের প্রথম টেস্ট অমীমাংসিত ভাবে শেষ হতে যাচ্ছে। ভারতের হাতে তখন সাত উইকেট। জামাইকার স্যাবাইনা পার্ক, ওয়েস্ট ইণ্ডিজে পেসারদের স্বর্গ। কিন্তু এ টেস্টে পিচ পেসারদের বিশেষ সাহায্য করেনি। ফলে, আশানুযায়ী ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেননি ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পেসাররা। তাই, ভাবা গিয়েছিল ঠুকুস ঠুকুস করে ভারতীয়রা দিনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু ক্রিকেট এমন এক অদ্ভুত খেলা, যে-খেলার শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কেউ নিশ্চিতভাবে বলতে পারে না, কী ঘটতে যাচ্ছে। আগে থেকে এ খেলা সম্পর্কে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা বোকামি ; কারণ, এক মহান অনিশ্চয়তার নামই ক্রিকেট। কিংসটনে, উত্তেজনায় ভরপুর প্রথম টেস্ট সেই কথাটাই আবার প্রমাণ করে দিয়েছে।

টসে জিতে ক্লাইভ লয়েড ভারতকে ব্যাট করতে পাঠালেন। খাঁটি পেস বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভারতের দুর্বলতা, শুধু লয়েড কেন, সারা পৃথিবী জানে। এবং ইমরানের বোলিংয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের পাকিস্তানে লুটিয়ে পড়ার ঘটনা তারই সাম্প্রতিক উদাহরণ। অতএব, দলের চারজন পেসারকে দিয়ে ভারতীয় ব্যাটসম্যানদের উড়িয়ে দেওয়ার কাজটাই উচিত হবে ভেবে, লয়েড ফিল্ডিং বেছে নিয়েছিলেন। ভয় পাওয়ার লোক গাভাসকর নন, চিন্তা ছিল গায়কোয়াড়কে নিয়ে। দেশীয় ক্রিকেটে প্রচুর রান করার জন্য এবং ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ভাল খেলতে পারেন বলে গায়কোয়াড়ের ওপর আশা ছিল অনেক। কিন্তু আমাদের হতাশ করে তিনি এক রানে আউট হলেন। মহিন্দর বোলারদের পরোয়া না করে যেভাবে খেলছিলেন, তাতে মনে হয়েছিল, তিনি একটি বড় ইনিংস গড়তে যাচ্ছেন। শেষ অবধি নিজের ভুলে অমরনাথ (২৯) উইকেটের পিছনে ধরা পড়েন। দুবার 'জীবন' পাওয়ার পরেও অসহিষ্ণু বেংসরকার বেশি রান করতে পারেননি। অপ্রয়োজনীয় ড্রাইভ করতে গিয়ে তিনি নিজেকে রিচার্ডসের হাতে তুলে দেন। শাস্ত্রীর ওপর আমাদের ভরসা করার যথেষ্ট কারণ ছিল। শাস্ত্রীও নিজের ভুলে উইকেট খোয়ালেন। অধিনায়ক কপিল, ক্রিজে এসেই, ছটফট করতে লাগলেন। ফলত, অবিলম্বে প্যাভিলিয়নের পথ দেখলেন। অফ স্টাম্পের বাইরে মারার যে হঠকারিতা

যশপাল শর্মা

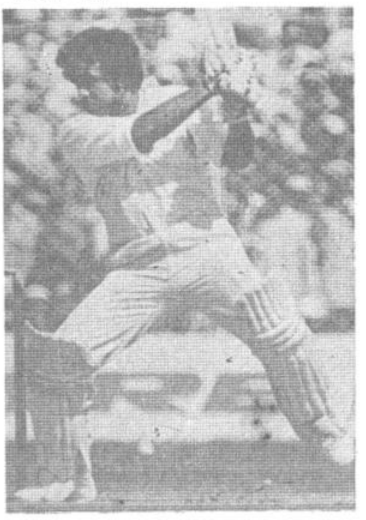

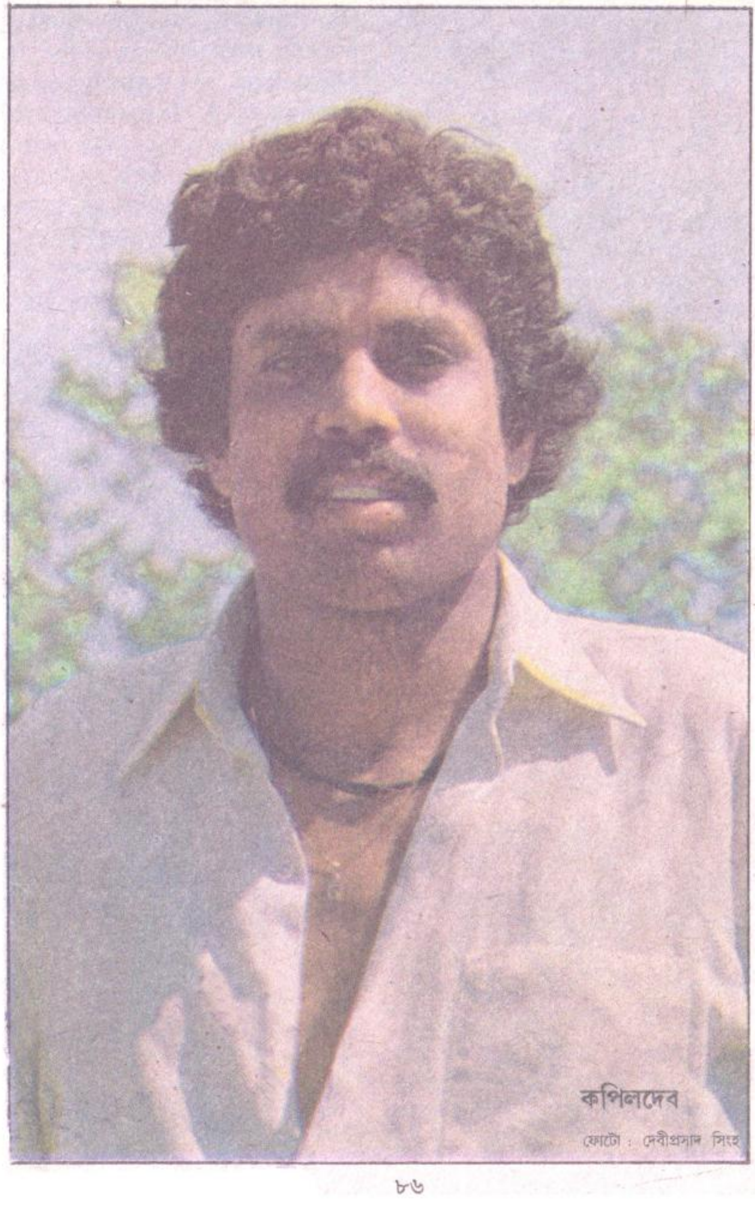

কপিলদেব

ফোটো : দেবীপ্রসাদ সিংহ

তার মাশুল গুনতে হল সহ-অধিনায়ক কিরমানিকে। অন্য প্রান্তে একা দাঁড়িয়ে যশপাল। শর্মার দুঃখ কিছু বুঝলেন সাঁধু, ভারতের অপমানকর অবস্থাও। জীবনের প্রথম টেস্টে, পাকিস্তানে, সাঁধু যেভাবে খেলেছিলেন, এবারও সেইভাবেই খেললেন। রান উঠতে লাগল চড়চড় করে। বাইরের বলগুলো তিনি যেভাবে ছাড়ছিলেন, ধারাভাষ্যকার মরিস ফস্টার তার প্রশংসা না করে পারেননি। বিপদের মুখে ৬৮ রানের চমৎকার কৃতিত্ব দেখিয়ে সাঁধু যখন ফিরলেন, তখন ভারতের রানসংখ্যা কিছুটা ভদ্রস্থ হয়েছে। সঙ্গে যশপালের দাঁতচাপা ৬৩ রানের পরিশ্রমের ফলে ভারতের ইনিংস ২৫১ রানে শেষ হয়। অষ্টম উইকেটের জুটিতে সাঁধু-শর্মা নতুন রেকর্ড করেছেন।

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বৈশিষ্ট্যময় ব্যাটিং করতে পারেনি। গ্রিনিজ ও হেনেস মারকুটে হিসেবে বিখ্যাত। কাজের বেলায় দেখা গেল, ধৈর্যময় রক্ষণাত্মক ব্যাটিংয়েও তাঁদের দক্ষতা চমৎকার। গুটি গুটি পঁচিশ রানে পৌঁছে হেনেস কপিলের বলে আউট হলেন। সব থেকে বড় ভয় রিচার্ডসকে। শাস্ত্রীর অতিরিক্ত বাঁক নেওয়া বলে রিচার্ডস হতভম্ব হয়ে যান। ক্যাচ ধরে বেংকট লাফিয়ে উঠেছিলেন। উঠবেনই তো। ২৯ রানের মাথায় রিচার্ডস আউট, ভাবা যায়! কিছু পরে গোমস ঠকে যান শাস্ত্রীর ফ্লাইটের চালাকিতে। ত্রিনিদাদের ব্যাটসম্যান লোগি, প্রথম টেস্ট খেলতে এসে, নিজের বিপদ নিজেই ডেকে আনেন, অযথা রান নিতে গিয়ে। বেংকটকে কাট করার চেষ্টা করতে গিয়ে লয়েড বোল্ড হন। গ্রিনিজকে যখন সেঞ্চুরির জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মনে হচ্ছে, তখন শাস্ত্রীর বলে চমৎকার ক্যাচ লুফে তাঁকে ফেরত পাঠান বেংকট। এরপর, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লেজের দিক ধ্বংস করার কাজে

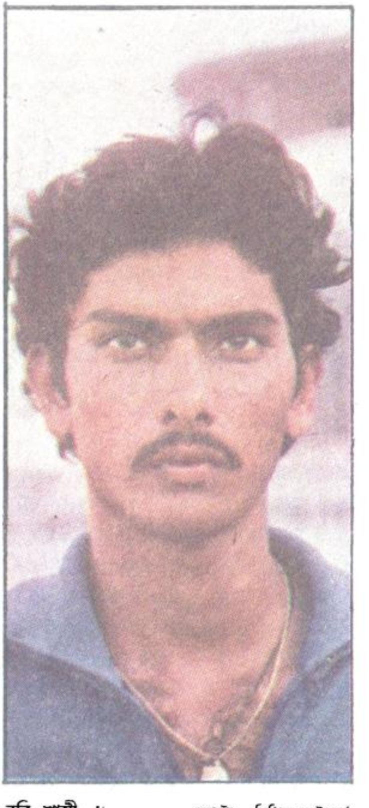

রবি শাস্ত্রী ফোটো : নিখিল ভট্টাচার্য

তৎপর হয়ে ওঠেন কপিলদেব। ভারতের অধিনায়ক দুজোঁ, মারশাল এবং হোলডিংয়ের বিদায়ের বন্দোবস্ত করে দেওয়ার ফাঁকে, শাস্ত্রী রবার্টসকে তুলে নেন। ২৫৪ রানে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ফুরিয়ে যায়।

দ্বিতীয় ইনিংসে সবচেয়ে বড় আঘাত হানেন মাইকেল হোলডিং, প্রথম বলেই লেগ স্টাম্প ছিটকে দিয়ে। অমরনাথের বেপরোয়া মার এবং গায়কোয়াড়ের সতর্ক ব্যাটিং এই জুটিতে ৬৮ রান তুলে দেবার

পর গালিতে মহিন্দরকে লুফে নেন গার্নার, মার্শালের বলে। এক রান পরে, একইভাবে, গায়কোয়াড় গ্রিনিজের হাতে ধরা পড়েন। মার্শালকে তৃতীয় উইকেট উপহার দেন বেংসরকর, অযথা স্কোয়ার কাট করতে গিয়ে। যশপাল দৃঢ়তার সঙ্গেই খেলছিলেন। হোলডিংয়ের দেরিতে ভাঙা আউট সুইংগার শর্মার ব্যাট ছুঁয়ে তৃতীয় স্লিপে গোম্‌সের হাতে চলে যায়। এরপর, ভারতীয় ইনিংসকে ছেঁটে দেবার কাজে, রবার্ট্‌স সাফল্য লাভ করেন। কপিল, কিরমানি, সাঁধু, বেংকট এবং মনিন্দরকে ফিরিয়ে রবার্টস ১৭৪ রানে ভারতীয় ইনিংস মুড়িয়ে দেন।

হাতে দেড় ঘণ্টা ও ছাব্বিশ ওভার, এবং জয়ের জন্য প্রয়োজন ১৭২ রান, এই অবস্থায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ব্যাট করতে নামে। ওভার প্রতি সাড়ে ছয় রানের প্রয়োজন ছিল। হেনেস প্রথম থেকেই ব্যাট চালাতে শুরু করেন। দ্রুতগতিতে ৩৪ রান করার পর, কপিলের বলে তাঁর লেগ স্টাম্প উপড়ে যায়। লয়েড তিন নম্বরে নেমে তিন রান করে বিদায় নেন। মাঠে নেমে খেলার ভোল পাল্টে দেন রিচার্ডস। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ক্রিকেটের 'সম্রাট' ব্যাটসম্যান, ক্রিজে এসেই, বল উড়িয়ে দেন মাঠের বাইরে। কাঁধে ব্যথা, আঙুলে চোট নিয়েও বিশ্বের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ ব্যাট্‌সম্যান যেভাবে খেলেছেন, তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। মূলত রিচার্ডসের মারাত্মক ব্যাটিংয়ের ফলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ের আলো দেখতে পায়। ঝড়ের গতিতে ৬১ রান করে রিচার্ডস যখন আউট হন, জয় তখন ওদের হাতের মুঠোয়। শেষে দুজোঁ অমরনাথের বল আকাশপথে মাঠের বাইরে পাঠিয়ে জয় এনে দেন। নাটকীয় জয়। অবিশ্বাস্য, অদ্ভুত।

রিচার্ডস সুস্থ হলে কী হবে কে জানে!

ডুরাণ্ড কাপ ভাগাভাগি

মণি শর্মা

সেমি-ফাইনালে অধিনায়ক জি এস পারমার খেলতে না পারায় জে. সি. টি. দল এমনিতেই কাবু হয়ে ছিল। তার ওপর, আর এক স্টপার ভাটিয়া ভাল খেলতে না পারায়, ইস্টবেঙ্গলের সামান্য অসুবিধেও হচ্ছিল না। নিজেদের মধ্যে ভাল বোঝাবুঝির ফলে বরং তারা বিপক্ষের বিপদসীমায় বারবার ঢুকে পড়তে পেরেছে। একটা সময়, ইস্টবেঙ্গলের খেলার ধরন থেকে বোঝা যাচ্ছিল ভয়ের কোনো কারণ নেই। জয় অনিবার্য। গোলটা হয়েছিল খেলার পঞ্চম মিনিটে। ভাটিয়ার ত্রুটিপূর্ণ ব্যাকপাস চরঞ্জিতের কাছে পৌঁছবার আগেই কৃষ্ণগোপাল তৎপরতার সঙ্গে বলটা জালে ঠেলে দেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে জে. সি. টি-র পক্ষে পেনাল্টির দাবি নিয়ে দর্শকরা হামলা করায় খেলা বন্ধ হয়ে যায়।

ফিরতি সেমি-ফাইনালে ইস্টবেঙ্গল টাই-ব্রেকারে জে সি টিকে হারিয়ে ফাইনালে ওঠে। খেলার নির্দিষ্ট সময়ে ইস্টবেঙ্গল তিনটি ও জে. সি. টি. দুটো গোল করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু তাতে কোনো ফল না হওয়ায় রেফারি টাই-ব্রেকারের নির্দেশ দেন। ইস্টবেঙ্গল ৪-৩ গোলে জিতে যায়।

অন্যদিকে মোহনবাগান সেমি-ফাইনালে পাঞ্জাব পুলিশকে ২—১ গোলে হারিয়ে দেয়। খেলায় বেশ উত্তেজনা ছিল। শেষ দিকে ঝিমিয়ে গেলেও পাঞ্জাব পুলিশ সহজে মোহনবাগানকে পথ ছেড়ে দেয়নি। ডুরাণ্ডের আগে প্রসূন সতীর্থ 'গৌতম সরকারের দক্ষতা প্রসঙ্গে কিছু সংশয় প্রকাশ

করেছিলেন। গৌতম বলেছিলেন, এর জবাব তিনি খেলাতেই দেবেন। সেমি-ফাইনালের খেলায় গৌতমের জবাব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছিল। শুধু চমৎকার খেলাই নয়, পাঞ্জাব পুলিশের বিরুদ্ধে গোলদুটিও তিনি করেছেন। পুলিশের পক্ষে একমাত্র গোলটি করেছেন বলবিন্দার।

ফলে ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে ওঠে কলকাতার চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দুই প্রধান দল—ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। এবার নিয়ে ইস্টবেঙ্গল ডুরাণ্ড কাপের ফাইনালে উঠল বারো বার, মোহনবাগান পনেরো বার। এর আগে এই দুটি ক্লাব পরস্পর পাঁচবার ফাইনালে খেলেছে। শেষ লড়াই হয়েছিল ১৯৭৯ সালে। সে খেলায় ইস্টবেঙ্গল ৩—০ গোলে জিতেছিল।

আগে, পাঁচবারের ফাইনালে মোহনবাগান মাত্র একবার, ১৯৬৪ সালে ইস্টবেঙ্গলকে ২—০ গোলে পরাজিত করেছিল। মোহনবাগান এর আগে দশবার ডুরাণ্ড জয়ের সম্মান লাভ করেছে। ইস্টবেঙ্গল এই সম্মান পেয়েছে আটবার।

কিন্তু আগে ফলাফল যাই হয়ে থাক, ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান লড়াইয়ের মেজাজই আলাদা। তার ওপর, ডুরাণ্ডে

ইস্টবেঙ্গলের অরূপ

মোহনবাগানের মানস

দেখা দীর্ঘ তিন বছর পর। আশা করা গিয়েছিল, এক ইঞ্চি জমিও কেউ সহজে ছাড়বে না।

লড়াই হয়েছিল। তবে উঁচুমানের হয়নি। সারা খেলায়, বলতে গেলে, আধিপত্য বজায় রেখেছিল ইস্টবেঙ্গল। গোল করার সুযোগও তারা অনেক বেশি সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু সে সুযোগ কাজে লাগাতে পারেনি। ওদিকে মোহনবাগানও কয়েকটা সুযোগ পেয়েছিল। তার মধ্যে একটা ছিল সোনার সুযোগ। পেনাল্টি সীমার মধ্যে, ডি'সুজার বাড়ানো বলে মানস শট নিতে পারলে বিপদ হতে পারত। মানস বলে পা লাগাতে পারেননি। ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে সহজতম সুযোগ নষ্ট করেছেন অরূপ দাস। সামনে ফাঁকা গোল পেয়েও তিনি সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে পারেননি।

গোলশূন্য অবস্থায় খেলা শেষ হওয়ায় দুটি দলকে যুগ্মজয়ী বলে ঘোষণা করা হয়। এই জয় নিয়ে মোহনবাগান ডুরাণ্ড জিতল এগারো বার, ইস্টবেঙ্গল ন-বার। দুই প্রধান এই প্রতিযোগিতায় যুগ্মজয়ী হল দুবার। প্রথম হয়েছিল ১৯৬০ সালে।

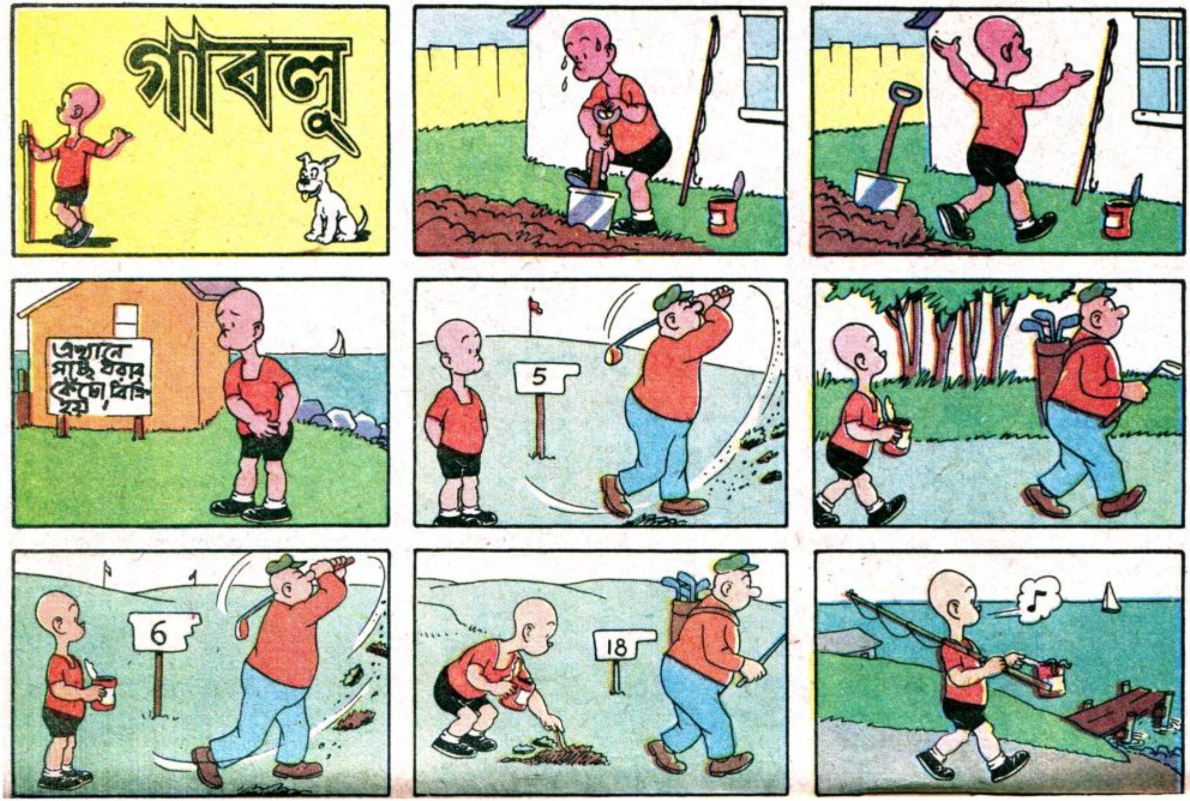
গাবলু
এখানে মাছ ধরার কেঁচো বিক্রি হয়।
5
6
18

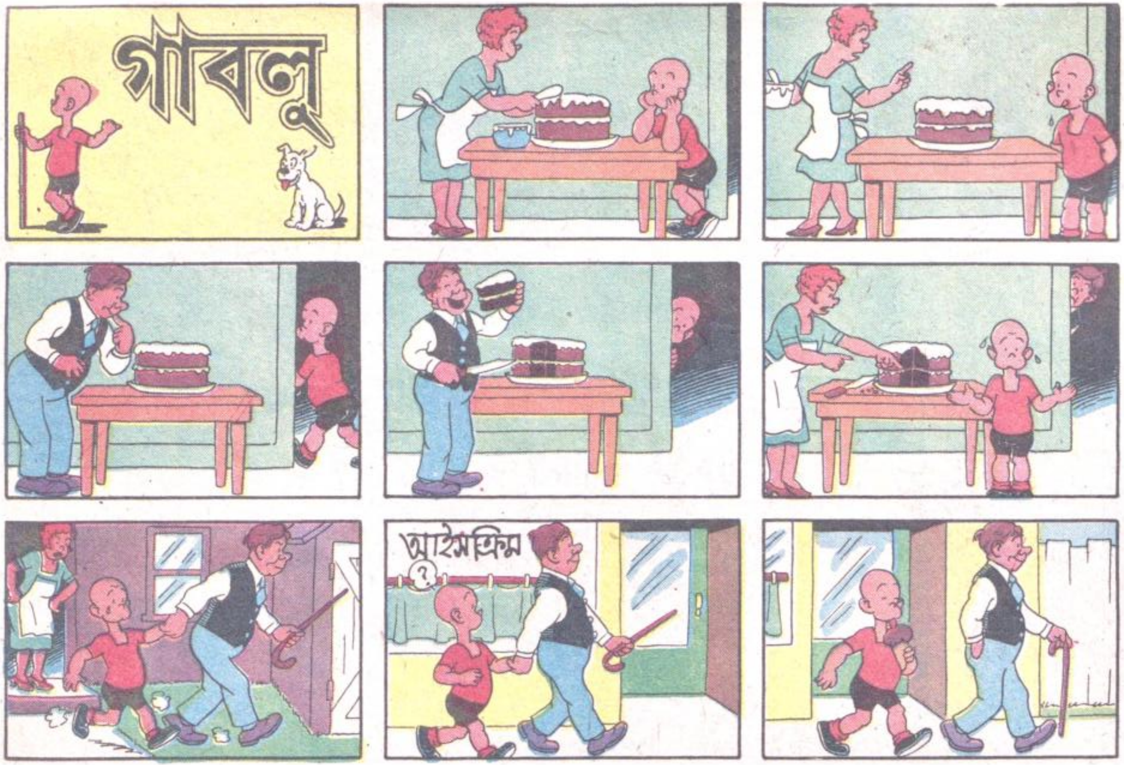
গাবলু
আইসক্রিম
?

ঠাকুরদাদার ওভারকোট

বাচস্পতি

ভন্টুর বাবা ফিরে এলেন সন্ধে নাগাদ। ভন্টুকে সেদিনের ভাষাবিজ্ঞানের পড়া কী হল জিজ্ঞেস করায় ভন্টু বলল, "স্বরধ্বনির গঙ্গাযাত্রা" হয়েছে। বাবা বুঝতে না পেরে হিগিনকাকুর মুখের দিকে তাকালেন; হিগিনকাকু মিটিমিটি হেসে বললেন, "ভন্টু একদম বিলকুল ঠিক বাত বলেছে। আমরা চন্দরবিন্দুওয়ালা স্বরদ্ধনি নিয়ে আলোচনা করেছি।"

"আর এখানেই তো স্বরধ্বনির শেষ, তাই নাকাকু ?"

"হ্যাঁ, যার গঙ্গাযাত্রা হয়ে গেল তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন ? তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে।"

"সে আবার কী ?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হিগিনকাকু উত্তর দিলেন, "এই ধরো, এখন আমরা 'ঋ'-ফলার উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব। সংস্কৃতের বর্ণমালায় ঋ স্বরবর্ণের মধ্যে গছানো রয়েছে। কিন্তু বাংলায় ঋ-এর উচ্চারণ পরিষ্কার 'রি', অর্থাৎ র্+ই। ব্যঞ্জনধ্বনি+স্বরধ্বনি মিলিয়ে একটা সিলেব্‌ল বা 'অক্ষর'। সুতরাং 'ঋ' বাংলায় 'স্বরবর্ণ' হলেও 'স্বরধ্বনি' নয়। অর্থাৎ বর্ণমালায় তা স্বরবর্ণের তালিকায় আছে কিন্তু উচ্চারণে তা কখনোই স্বরধ্বনি নয়। সংস্কৃত 'ঋ' বাংলায় উচ্চারিত হয় 'রি', অন্যদিকে মারাঠি গুজরাটি ওড়িয়াতে হয় 'রু'। যেমন 'অম্রুতাঞ্জন'।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, সেদিন সংযুক্তা পানিগ্রাহীর ওড়িশি নাচ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দশাবতার স্তোত্রের গান শুনলাম—'কেশবধৃত মীন শরীর'—তা গাওয়া হল 'কেশবধ্রুত মীনশরীর।"

"ঠিক বলেছ। ঋ এখন আর কোনো স্বরধ্বনি নয় বাংলায়।"

"তাহলে সে আমাদের বর্ণমালায় বসে আছে কেন ?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল। "সেইটাই তো মজা। এ বর্ণমালাটাও আমাদের নয়। এ হল সংস্কৃতের বর্ণমালা। আমরা প্রায় হুবহু তার ছাঁচটা ব্যবহার করে চলেছি। এ হল ঠাকুরদাদার ওভারকোটের মতো। ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন, ট্রাঙ্কে তুলে রাখা তাঁর ওভারকোট বার করে নাতি ব্যবহার করছে। কিন্তু গায়ে ঠিক ফিট করে না। কোথাও একটু ঢিলে, কোথাও একটু চাপা। আমাদের বর্ণমালাও তেমনি।"

"কী রকম ?"

"ধরো বর্ণমালায় স্বরবর্ণ হল অ থেকে ঔ। কিন্তু ঈ, ঊ, ঋ আমাদের উচ্চারণে নেই বললেই হয়। সেগুলো বাড়তি বর্ণ। ওভারকোটটা এখানে ঢিলে। আবার আমাদের মুখের 'অ্যা' ধ্বনিটার জন্যে কোনো 'বর্ণ' নেই—এখানে ওভারকোট একটু চাপা। ঐ ঔ হল আরেক কাণ্ড।"

"সে আবার কী ?" বাবার প্রশ্ন।

"কথা হল, ঐ আর ঔ একটা একটা স্বরধ্বনি নয়, দুটো করে স্বরধ্বনির যোগফল। এদের বলে যৌগিক স্বর বা ইংরেজিতে ডিফ্‌থং। সংস্কৃতে ঐ দুটোই ছিল যৌগিক স্বর। বাংলায় আছে প্রায় দেড় ডজন। বর্ণমালায় দুটোর জায়গা হল, বাকিগুলোর খোঁজ কে নেবে ?"

"ঠাকুরদাদার ওভারকোট নিয়ে ঝামেলা তো কম নয়।" ভন্টু বলে উঠল। (ক্রমশ)

টেলিগ্রাম

প্রসাদ

সেদিন রাত এগারোটার সময় কলিংবেল বেজে উঠল।

"Who can that be, at this hour ?" Mummy asked.

Daddy, who had been doing his crossword, raised his eyes and looked at Chambal.

Chambal, who had been listening to the radio, looked at Milly. Who showed no signs of stirring from the side of Mummy. She only snuggled closer to her.

Chambal got up and went to the front door.

Who was it ?

Chambal opened the door.

Telegram !

কাগজে সই করে টেলিগ্রাফ-পিয়নকে বিদায় দিতে, তারপর খাম খুলে টেলিগ্রামটা বের করতে যতটুকু সময় লাগে তার মধ্যেই কত রকম ভাবনা শুরু হল।

Who could have sent a telegram ?

Was it Aunt Sarala who lived in Shillong ?

Or was it Uncle Bimalendu who was a doctor in Bhubaneshwar and had not been keeping well for some time ?

Milly was thinking of all who might have sent the telegram.

ততক্ষণে বাবা টেলিগ্রামটা খুলে ফেলেছেন।

He glanced at the telegram and handed it to Mummy.

Mummy read it aloud. "Arriving Friday Morning. Robin."

রবীন ? কই, মিলি তো ও নাম কোনো দিন শোনেনি ?

"Who's Robin, Mummy ?" Milly asked.

"I don't seem to have heard that name either," Mummy said. "A friend of yours ?" she asked Daddy.

"Not a friend," Daddy said, "A cousin. He's the cousin, who went to Africa many years ago. He's been living in different parts of North and Central Africa. Haven't you ever heard me speak of him ?"

"Perhaps I have. Now that you mention it, I do seem to recall hearing about him once or twice."

"He ran away from home. It was years before we heard from him."

এসব শুনছে, আর দুই ভাই-বোনের চোখ বড় বড় হয়ে যাচ্ছে।

Chambal, who had read many stories of African adventures, was getting more and more excited.

So was Millly. She was thrilled at the idea of meeting a man from Africa the very next morning.

লক্ষ করো :—

Daddy, who had been doing his crossword, raised his eyes.

Was it Aunt Sarala, who lived in Shillong ?

Milly was thinking of all who might have sent the telegram.

He's the cousin, who went to Africa.

আমাদের পুকুরের পদ্ম

আমাদের বাগানে একটা পুকুর আছে। সেই পুকুরের চারধারে কত গাছ—আম, শিরিষ, সোঁদাল, ফলসা, বেল—আরও কত কী।

সেই গাছগুলোর ডালে ডালে কত পাখি গান গায়। মৌমাছি গুনগুন করে। সবচেয়ে ভাল লাগে পুকুরের জলে ফুটে-থাকা পদ্মগুলো। পদ্মবনে লুকিয়ে থাকে সাপ। পুকুরপাড়ে বাসা করে থাকে ডাহুক পাখি। ডাহুকপাখির ছানা খাবার জন্যে সাপগুলো পদ্মবনে ঘুর-ঘুর করে।

ডাহুক মা তার ছানাদের বাঁচাবার জন্যে সাপের সঙ্গে লড়াই করে। সেই লড়াইয়ে সাক্ষী থাকে পদ্মফুল। আমার এই ছবিতে আমাদের পুকুরের একটি পদ্ম আমি এঁকেছি। আমবনের একটি মৌমাছি পদ্মমধু খাওয়ার জন্য উড়ে আসছে। আমাদের এই পুকুরটাকে সবাই পদ্মপুকুর বলেই জানে।

ছবি ও লেখা রাজর্ষি মিত্র (বয়স ১২)

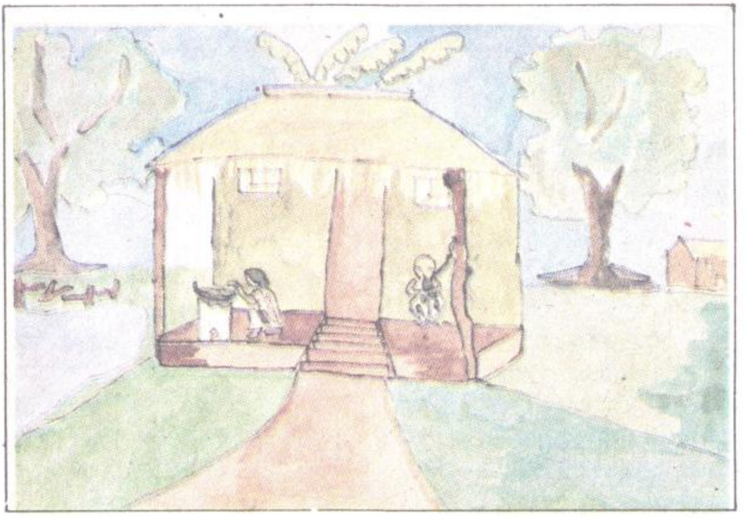

ছবি এঁকেছে সুদীপ রায় (বয়স ৮)

ছবি এঁকেছে রোনিতা ঘোষ (বয়স ২ বছর ৬ মাস)

একা বাইরে যাই না

বন্ধুরা বাইরে যায়

আমাদের বাড়ির চারিদিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। আমি একা-একা বাইরে যাই না।

বাইরে গেলে বাবা-মা'র সঙ্গেই যাই। আমার বয়সের ছেলেরা কিন্তু একা-একা বাইরে যায়।আমি যেতে পারি না বলে মাঝে-মাঝে লুকিয়ে কাঁদি। যদি মাকে বলি, 'বাইরে যাব,' মা বলেন, 'না'।

আমি তাই এখন অনেক কবিতা ও গল্প লিখি। একটা দাবাও কিনেছি। আমি মোটামুটি দাবা খেলতে পারি। দাবা খেলে আমার বেশ সময় কেটে যায়।

দেবাশিস বালা (বয়স ৭)

ময়নার সাজে

আমার খুব ময়না পোষার শখ। বাবাকে রোজই আমি ময়না কিনে দিতে বলতাম।

কয়েকদিন পরে বাবা একটা খাঁচাসমেত ময়না কিনে আনলেন। পাখিটাকে দেখে আমি তো খুব খুশি। পাখিটাকে আমি খুব যত্ন করতাম। খাবার দিতাম। কিন্তু ওর ডাক শুনে আমার কেমন যেন সন্দেহ হত!

একদিন পাখিকে চান করাবার সময় দেখি, ওর গা থেকে কালো রঙ বার হচ্ছে। তারপর রঙ পালটাতে পালটাতে লালচে হয়ে গেল পাখি। তখন দেখলাম, ও ময়না নয়, শালিক।

কিংশুক দে (বয়স ১০)

ছবি এঁকেছে সুশান্ত পাল (বয়স ৯)

হুশ্ বললেই দুই পা

অনেকদিন আগে এক গ্রামে বাস করতেন এক জমিদার। তাঁর নাম ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি সারসের মাংস খেতে খুব ভালবাসতেন। কিন্তু কেউ না দিলে খেতেন না।

একদিন তাঁর এক বন্ধু তাঁকে সারসের মাংস উপহার দিলেন। তিনি সঙ্গে-সঙ্গে সেটি বাবুর্চিখানায় পাঠিয়ে দিলেন।

সেই বাবুর্চি খুব ভাল রাঁধতে পারত। তার রান্নার গন্ধে তারই এক বন্ধু থাকতে না পেরে রান্নাঘরে ঢুকে সারসের একটা ঠ্যাং চাইল। কিন্তু বাবুর্চি দিতে রাজি হল না। ওদের মধ্যে কথা কাটাকাটির পরে জোর ঝগড়া লেগে গেল। শেষ পর্যন্ত বাবুর্চিকে একটা ঠ্যাং দিতেই হল।

রাত্রে খেতে বসে ব্রজেন্দ্রনাথ দেখলেন, সারসের একটা ঠ্যাং নেই। তিনি তখন বাবুর্চিকে জিজ্ঞেস করলেন, "একটা ঠ্যাং কেন?"

বাবুর্চি বলল, "সারসের একটাই ঠ্যাং ছিল।"

এ-কথা শুনে ব্রজেন্দ্রনাথ খুব রেগে গেলেন, কিন্তু তাঁর এক বন্ধু সঙ্গে থাকায় তিনি আর কিছু বললেন না। পরে বললেন যে, কাল সক্কালবেলায় তাঁকে দেখাতে হবে সারসের কটা পা। সেদিন রাত্রে রাগের চোটে তাঁর ঘুম হল না।

পরদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বাবুর্চি আর কয়েকজন লোককে সঙ্গে নিয়ে তিনি নদীর দিকে গেলেন। যেখানে অনেক সারস থাকে।

নদী থেকে একটু দূরে দাঁড়িয়ে বাবুর্চি দেখল সারসগুলো এক পা তুলে ঘুমোচ্ছে। সে তখন একটু নিশ্চিন্ত হল। তারপর নদীর কাছে যেতেই সে ব্রজেন্দ্রনাথকে বলল, "দেখুন সারসের একটা পা হয় কি না।"

তখন ব্রজেন্দ্রনাথ কিছু না বলে শুধু বললেন, "হুশ্, হুশ্!" অমনি সারসগুলো আর একটা পা নামিয়ে দিয়ে উড়ে গেল।

ব্রজেন্দ্রনাথ তখন বাবুর্চির দিকে ফিরে বললেন, "এইবার!"

বাবুর্চি একটুও বিচলিত না হয়ে বলল, "আপনি যদি কালকের রান্না-করা সারসটাকে বলতেন হুশ্ হুশ্, তাহলে সে-ও আর একটা পা নামিয়ে দিত।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বললেন, "তুমি খুব বুদ্ধিমান। এ যাত্রায় তুমি বেত্রাঘাত থেকে বেঁচে গেলে, কিন্তু এরকম আর কক্ষনো কোরো না।"

সুনৃতাবরী সেন (বয়স ১২)

বাঘা

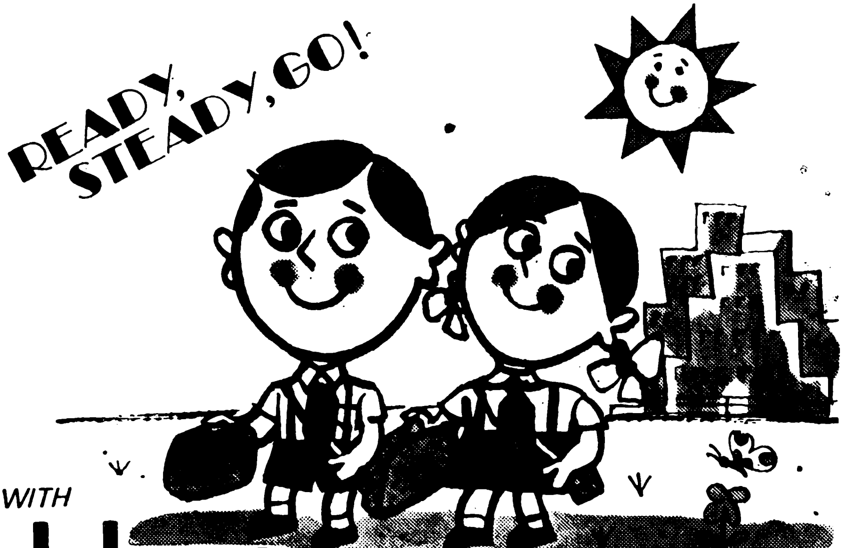

WITH

Jalans SCHOOL BAG

★ It is for you,. light as you wanted it to be, but roomy enough for all your books, tiffin box, pencil box and even comics.

Created in colours of Cherry Navy blue, Green..........to match your School Uniform and likes. Carry it anywhere you want after school to swim, picnics or even a short holiday.

like it? Now get your folks to present you one on your birthday.

★INDIA'S First Moulded School Bag made for you by—

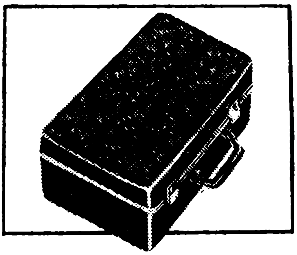

SHREE LAXMI ENTERPRISES

2, LALBAZAR STREET, CALCUTTA-700 001

ZOREX/10

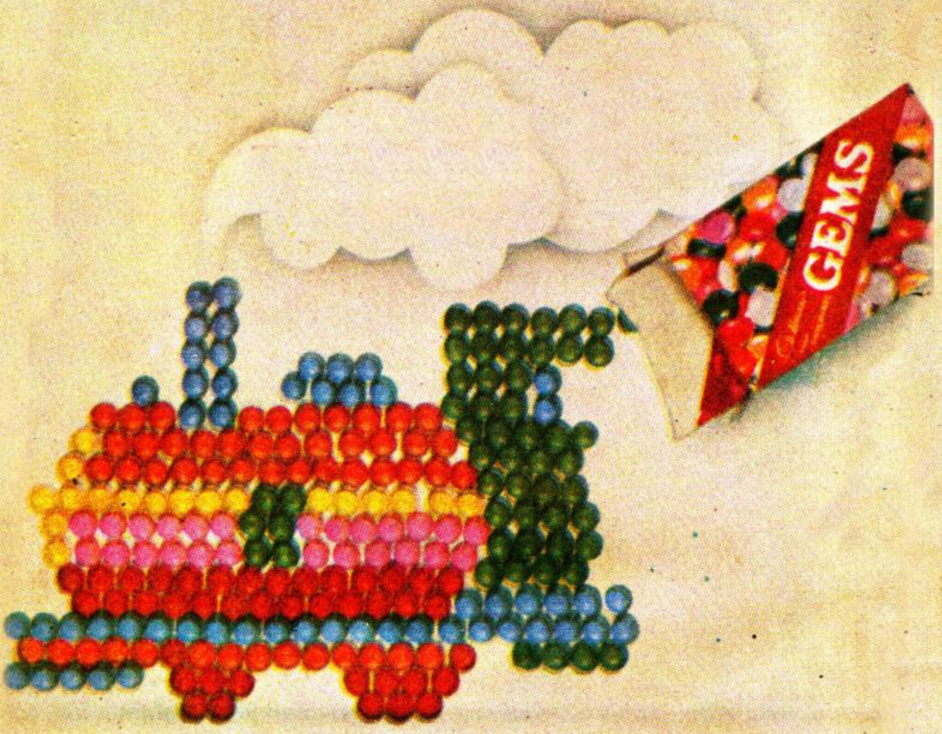

সবাই চড়ল, গাড়ী ভরল,
ঝুকঝুক ক'রে মোদের রেল ছুটল।
গাড়ী বোঝাই ক'রে, জেমস্ নিয়েছি ভরে
প্রতিদিন খাব মোরা দারুণ মজা ক'রে!

স্বপ্ন সুন্দর কত... জেমস্ আনো পারো যত!

ক্যাডবেরিস্
চকোলেটস

ক্যাডবেরি জেমস্ এমন, মিষ্টিমধুর স্বপ্ন যেম

OBM/9525C